শারদীয়
১৪০৫

অনুবাদ পত্রিকা

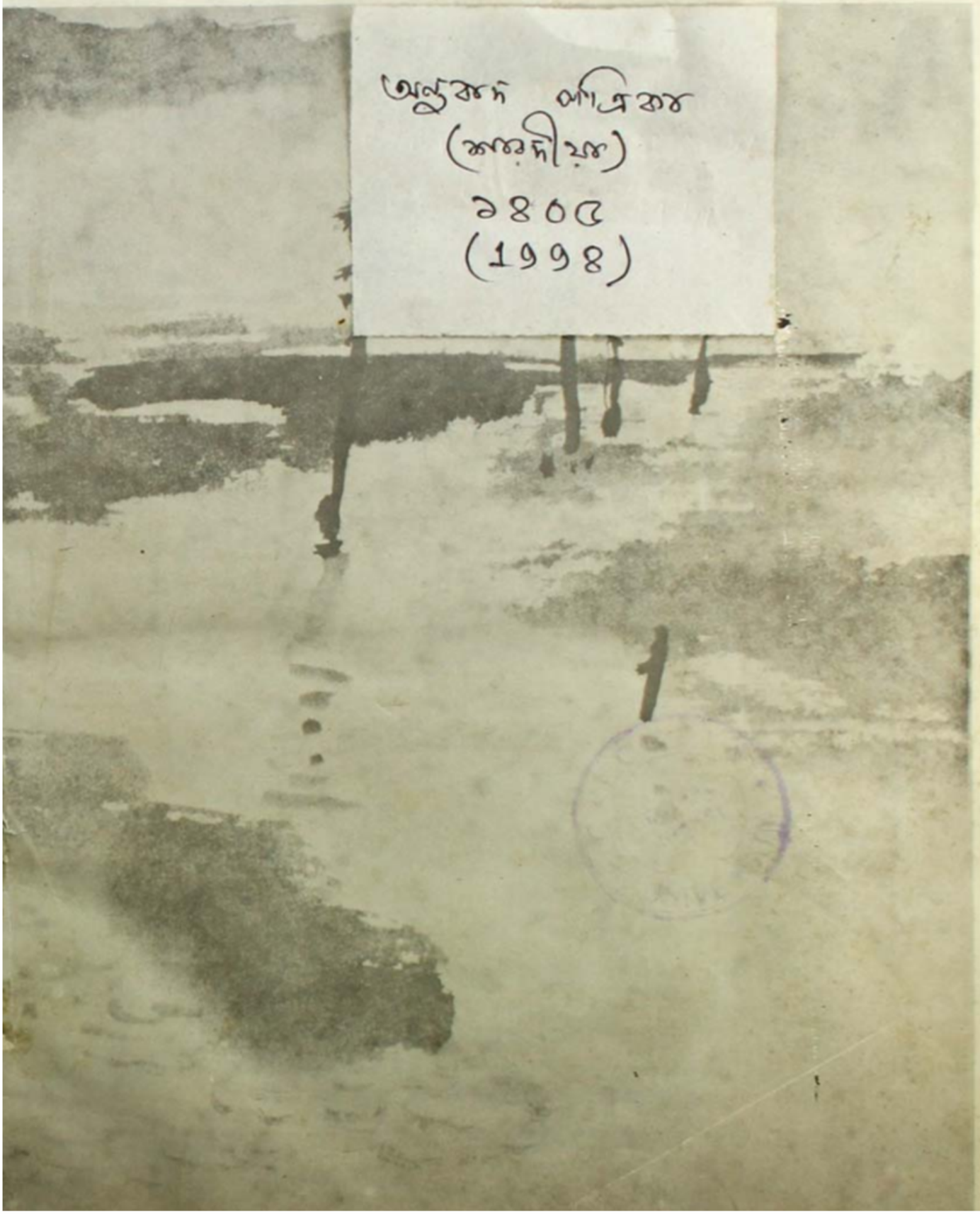

With best compliments
from

Indian Aluminium Company, Limited

Regd & Corporate Office: 1 Midddleton Street, Calcutta-700 071
Tel: 91 33 240 2210:Fax: 91 33 240 3964

শা র দী য়

অনুবাদ পত্রিকা

১ ৪ ০ ৫

সম্পাদক ঃ বৈশম্পায়ন ঘোষাল

Registration No- N 27088/75
Anubad Patrika

October-1998
Rs. 10·00

'ভাষা সংসদ'এর পক্ষে

P 31121

প্রচ্ছদ-শিল্পী : হিরণ মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক : বৈশম্পায়ন ঘোষাল
দীপঙ্কর প্রেস, রতিকান্ত নস্কর ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।
অনুবাদ পত্রিকা, ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন—৫৫৭ ৬৬৯০

সূচিপত্র

ঝরোখা থেকে
অনুবাদ : অতুল কুমার কর

স্প্যানিশ প্রবন্ধ অক্তাভিও পাসের সমর
কার্লোস ফুয়েন্তেস
অনুবাদ : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

হিন্দী গল্প এক যে ছিল অনিতা
অনিতা প্রীতম
অনুবাদ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি মেয়ে : পানপাত্রে-সুরা
অনুবাদ : সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওড়িয়া গল্প রেবতী
ফকিরমোহন সেনাপতি
অনুবাদ : এষা দে

পোলিশ গল্প ঘড়ি
ঈবকভোয় উরোজাইলেকি
অনুবাদ : সলীলন চট্টোপাধ্যায়

আইরিশ গল্প অধিবেশন
আইজ্যাক ব্যাশেভিস সিঙ্গার
অনুবাদ : অতুল কুমার কর

ফরাসী গল্প সুখ
মার্সেল অ্যুর্মে
অনুবাদ : ভূষার চৌধুরী

রুশ গল্প পুরোনো সেই দিনের কথা
তাসিলি বেলভ্
অনুবাদ : অর্ঘ্য ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা
ভ্যাসিলি বেলভ
অনুবাদ : কৃশল দেবশর্মা

উর্দু কবিতা ইকবাল থেকে
অনুবাদ : পদ্ম ঘোষ

মহম্মদ নকল ইসলামের কবিতা
অনুবাদ : অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ওড়িয়া কবিতা প্রসন্ন পাটশানি
অনুবাদ : অরুণ কুমার চক্রবর্তী

তেলুগু কবিতা যোগুয়ার কবিতা / বাদ্দুত
অনুবাদ : সোমক রায়

২৪ মারাঠি কবিতা পুরুষোত্তম-শিবরামে রেসে
অনুবাদ : শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাঁওতালী কবিতা সাঁওতালী লোকগান সমগ্র
অনুবাদ : মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুমা গান
লালু রামচাঁদ মুরমু
অনুবাদ : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

কন্নড় কবিতা বি. আর. লক্ষ্মণ রাও
অনুবাদ : ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় ৩৩

কৈফিয়ত
বি. টি. ললিত নায়ক
অনুবাদ : ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

কন্নাড় কবিতা পরিবের মৃত্যু
বোদলেয়র
অনুবাদ : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

স্প্যানিশ কবিতা সেই সব মৃতদেহ
পাবলো নেরুদা
অনুবাদ : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

গুজরাটি কবিতা খবরের পুরনো কাগজেরা
অরুণ কোলাটকার
অনুবাদ : কমলকুমার দত্ত

তেলুগু কবিতা যেখানে দুতোর প্রেম চোখ মেলবে
সি নারায়ণ রেড্ডি ৩৮

আত্মকথা
এম গোপী ৩৮

হিন্দী কবিতা দুর্ঘটনা
চন্দ্রকান্ত দেওতালে
অনুবাদ : শবরী ঘোষ ৩৮

মণিপুরী সংস্কৃতি মণিপুরী নৃত্যনাট্য
লায়লী ঘোষ

প্রবন্ধ গালিবের কবিতায় প্রেম
পুলিন মুখোপাধ্যায়

ইতালীয় নাটক পিন্ বল খেলোনা আর কেন জেলস্
দারিও-ফো (নোবেল সাহিত্যিক, ১৯৯৭)
অনুবাদ : শচীন দত্ত

সম্পাদকীয়

'অনুবাদ পত্রিকা'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল।

প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক নানান বিপন্নতার ভেতর 'অনুবাদ পত্রিকা' ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করে এসেছে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে তার যাত্রা চলেছে বিশ্বের মহাসিন্ধুর দিকে। অনেক প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও আমাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় সমস্ত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন এবং বর্তমান শারদসংখ্যায় সেই পথে ঋগ্বেদ-এর কবিতাসূক্ত থেকে শুরু করে হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড়, গুজরাটী, মারাঠী ও পঞ্জাবী সাহিত্য প্রকাশ করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিবাসী সাহিত্য এবং মণিপুরের সংস্কৃতি। সম্মিলিত হয়েছে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়ান ও স্প্যানিশ সাহিত্যধারা।

আমরা হার্দ্য অভিনন্দন ও শারদ শুভেচ্ছা জানাই এই সংখ্যার সমস্ত অনুবাদক, লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই 'একালের রক্তকরবী', 'দাহপত্র' পত্রিকা এবং সোমক দাসকে।

সবিনয়ে জানাই, পূর্বতন 'অনুবাদ পত্রিকা'-র দ্বিভাষীয় প্রকাশরূপকে পরিবর্তন করে আমরা শারদ সংখ্যা শুধু বাংলাভাষায় প্রকাশ করলাম। কারণ, 'অনুবাদ পত্রিকা' প্রকাশিত হয় পশ্চিমবাংলায় এবং মাতৃভাষার কারণে সর্বাধিক পাঠকও বাংলাভাষী। তাই বেশ কিছুদিন ধরে একই পত্রিকায় এই দ্বিভাষার বিষয়টি পাঠককে কিছুটা অসুবিধের মধ্যে ফেলেছিল। আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। তাই এই সংখ্যা থেকে আমরা সমস্ত ভাষার সাহিত্যই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণায়নের দিকে আমাদের যাত্রা।

আমরা আহ্বান করছি ভারতীয় সমস্ত ভাষার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং সাম্প্রতিকতম অনুবাদ। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিচিত্র দিক। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভিন্নধর্মী গদ্য, কবিতা, গল্প, চিন্তা, দর্শনের সমন্বয়।

আমরা স্নাত হতে চাই ভারতীয় শতপ্রদীপের আলোয় এ বিশ্বের মহাসিন্ধুনীরে। আমরা শারদ অভিনন্দন জানাই সমগ্র বিশ্বকে। প্রায় চব্বিশ বছরের 'অনুবাদ পত্রিকা'-আরও দীর্ঘ পথ যেতে চায় পথ আবিষ্কারেরই আনন্দে, সমগ্র মানবসংস্কৃতিরই প্রাণময় সম্মেলনের আনন্দে।

বৈশম্পায়ন ঘোষাল

With Best Compliments From :—

KILBURN REPROGRAPHICS LIMITED

7, RED CROSS PLACE

CALCUTTA-700 001

Ph No. 248 6642 / 4706, 210 2823 / 2824

Fax.-No. 248 4345

KILBURN PITNEY BOWES, ELECTRONIC POSTAL FRANKING MACHINES

KILBURN MITA PLAIN PAPER COPIERS

KILBURN AMMONIA PRINTING MACHINES AND ROTRING SCRIBERS

With best Compliments from :—

*

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

BERGER HOUSE

129, PARK STREET

CALCUTTA 700 007

With Best Compliments from :—

*

SPRING STEEL PRODUCTS

SHEET METAL FABRICATORS

1, PAVLOVA

10, LITTLE GIBBS STREET

BOMBAY-400 006

ঋগ্বেদ থেকে

অনুবাদ : অতুলকৃষ্ণ গুপ্ত

রাত্রি-সূক্ত

(রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।)

চতুর্দিকে সুবিস্তীর্ণা রাত্রিদেবী এসে, নক্ষত্র সমূহে
সারা বিশ্ব শ্রীপূর্ণ করলেন। ১
দেবতারূপিনী রাত্রি উর্দ্ধ অধোবাসী সকলকে আচ্ছন্ন করলেন,
জ্যোতিতে আঁধার প্রতিহত। ২
উষাকে ভগিনীরূপী রাত্রিদেবী গ্রহণ করবেন,
অন্ধকার হয় বিদূরিত। ৩
সেই রাত্রি আমাদের শুভঙ্করী হোন, যাঁর আগমনে পাখিও
আমরা
কৃষ্ণবর্ণা পক্ষীদের মত। ৪
গ্রামগুলি অতি শান্ত, সকলেই গভীর নিদ্রায়, পদচারীগণ
পক্ষীগণ,
নিত্য-অর্থী যত তেন গণ। ৫
হে রাত্রি, আমাদের কাছ থেকে বৃক-বৃকী, তস্কর সমূহ দূর
ক'রে
আমাদের হও শুভঙ্করী। ৬
নিকট আচ্ছন্ন করে, বিস্তারিত সুস্পষ্ট আঁধার,
অন্ধকার হতে আমাকে মুক্তি দাও উষা, ঋণমুক্তির মতন।
হে আকাশ-কন্যা রাত্রি, তোমাকে অর্পিত এই স্তবগুলি
গাভীর মতন, আকাঙ্ক্ষিত হোক, ফিরায়ো না। ৮

অরণ্যানী সূক্ত

(অরণ্যানী দেবতা। দেবমুনি ঋষি। অনুষ্টুপ ছন্দ।)

অরণ্যানি, অরণ্যানি, ঐ দূর দিকে যেন হঠাৎ যেয়ো।
গ্রামের কথা তো তুমি জিজ্ঞাসা করনা, জন্তুর মতন তুমি
কিছু কি জান না? ১
কোনথা প্রাণীর বৃষরবে, চিঁ-চিঁ শব্দে উত্তর অঞ্চল।
প্রাণীরা বীণার ঘাটে ঘাটে শব্দ তুলে গায় যেন অরণ্যানীর
মহিমা। ২
ভ্রম হয়, গাভীগণ বিচরণ করে, অট্টালিকাবৎ কোথাও বা
কিছু দেখা যায়।
অসংখ্য শকট যেন সন্ধ্যায় নিগত হয়, অরণ্যানী থেকে। ৩
কবে কেউ গাভীকে আহ্বান? কাষ্ঠেরই কি অন্ত কেউ
করে?
অরণ্যবাসীর, মনে হয় কেউ করে সন্ধ্যায় চীৎকার। ৪
অরণ্যানী প্রাণবধ করে না তো কারো, অন্ন পন্ত না এলে
সবাই নির্ভয়ে
স্বাদু ফলাহার ক'রে আর আপন অভীষ্ট লাভ করে। ৫
বসনাভীলঙ্কী। সৌরভময়ী, একান্ত কৃষকফুলহীনা,
বনমাতা অরণ্যানী, এই তো তোমার প্রশস্তি গেয়েছি। ৬

[অরণ্যানী = বৃহৎবন।]

ওকতাভিও পাসের সময়

কার্লোস ফুয়েন্তেস (১৯২৮)

অনুবাদ : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

[মেক্সিকোর জন্ম। লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। তাঁর প্রথম দিকের কাজের ক্ষেত্র ছিল আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতি, লেখালেখি শুরু করেন পরে। তাঁর গদ্য বারোক রীতির, লেখায় মধ্যে মেক্সিকোর কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। তীব্র যৌনতা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রচুর উল্লেখ, মেক্সিকোর বিপ্লবের সমালোচনা, এ সবই তাঁর লেখালিখির বিশিষ্ট মাত্রা।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী
আর্তেমিও ক্রুস-এর মৃত্যু (লা মুয়েরতে দে আর্তেমিও ক্রুস) (১৯৫২).
চামড়া বদল (কামবিও দে পিয়েল) (১৯৬৭)
তেরয়া নোসত্রা (তেরয়া নোসত্রা) (১৯৭৫)]

'কে এ কথা বিশ্বাস করবে ! তবু শোনা গেছে, সময়ের ওপর রাগ করে
নতুন কর্তারা[১] হল প্রত্যেক বিনারের নীচে ঘড়ির দিকে গুলি ছুঁড়ছে,
সূর্য যাতে অস্ত না যায়'—

এইভাবে জুলাইয়ের[২] বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলির কবি এক আশ্চর্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্যারিকেড রাস্তায় পাতা হয়েছিল যুদ্ধের প্রথম দিনে। সে সব সরিয়ে ফেলার পর কিছু কিছু দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্যারিসের গলিতে ঘুরতে ঘুরতে সব টাওয়ারের ঘড়ির দিকে গুলি ছুড়তে লাগল। দিনটাকে আটকাবার জন্য ? এক হিসাবে তাই বটে। যেন বর্তমানকে ধরে রাখার, তাকে বর্তমানের ভেতরেই প্রোথিত করার চেষ্টা। বিপ্লবের চরিত্রই হল এক তাৎক্ষণিক, তীব্র, পলায়মান উচ্ছ্বাস যা ফুরিয়ে যায়। ফিরে আসে না। প্রত্যেক বিপ্লবী নিজের মনে বলে, "মানুষ এর সমান কিছু দেখেনি" : রাজারা ক্ষমতায় ফিরে আসে, চাষীরা পাহাড় থেকে নেমে আসে, এক প্রেমিকযুগল মুলতায় দাঁত বিশেলের ব্যারিকেডে হৃদয় বিনিময় করে আর পানবাঁধানো রাস্তার নীচে আবিষ্কার করে সমুদ্রতীর ; মেক্সিকো সিটিতে পাঞ্চো ভিইয়া ও এমিলিয়ানো সাপাতার[৩] প্রবেশ, সিটাদেলের ঐতকালীন প্রাসাদ দখল,[৪] লংমার্চ,[৫] কমিউনের[৬] কদিনে শাসিত মৃতদেহগুলো হচ্ছে বলিভিয়ান কদিনে তাকা চে গেভারার[৭] ঝলমলে মৃতদেহ। ঘড়ির দিকে গুলি ছোড়া, যাতে সময় বন্ধি হয়, আর যে মুহূর্ত কখনও ফিরে আসবে না সেটা হয়ে যায় চিরকাল, যে মুহূর্ত ইতিহাসের চরম বিকাশের সাক্ষী, তা অলৌকিকভাবে মিলিয়ে যায় স্মৃতি ও আশার কুয়াশায়। একটি নস্টালজিয়া ও একটি প্রত্যাশার লক্ষ্যবস্তুর আরম্ভের অন্তরালে চলে যেতে চায় না সময়।

সময়ের এই বিপ্লবী ছকের পরিপ্রেক্ষিতে ওকতাভিও পাসের সাহিত্য বিচার্য। মাত্র কিছুদিন আগে আমি বেশি করে স্মরণ করেছিলাম সেই লেখককে যিনি মেক্সিকোর মানসিক স্বাধীনতার উচ্চতম উদাহরণ, যিনি মোরেলোস উপত্যকার গ্রামের মধ্যে উত্তর আমেরিকান লেখক জ্যাক লেনডনের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন।—আমরা একটি নামহীন

গ্রামে এসে দাঁড়ালাম। মানচিত্র তাকে ভুলে গেছে, পথনির্দেশিকায় তার উল্লেখ নেই। আমরা এক চাষীকে প্রশ্ন করলাম, ও গ্রামের নাম কী? উত্তর এল, "শান্তির সময় গাছইনিও, যুদ্ধের কালে লাপাতা।" এই লোকটি লাপাতা-গ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সে অন্য এক সময়ের কথা জানত। সে একই সঙ্গে চাইত অতীতের এক সময়কে, উৎসের, আরম্ভের এক সময়কে, এবং ভবিষ্যতের এক সময়কেও, যা নিশ্চিতভাবে অতীতের পরিপূরক হবে। তার অর্থ: শ্বাস সময় ও কাঙ্ক্ষিত সময়ের সাক্ষাৎ, এবং একে অন্যতে পরিণত হওয়া। মোরেলোসের এই চাষী আমাদের পাসের এক কবিতা শুনিয়েছিল: "সময়কে মেনেই নেয় কারার ক্ষুধা।"

পাসের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি সময়ের মূর্ত রূপ। গুলির আঘাতে বিদ্ধ হওয়ার আগে ঘড়ি যে সময় দেয়, সে সময়ের নয়। এ মানবসময়ের ত্রয়ী রূপ, যা সত্তাই 'দিনটাকে আটকায়', বর্তমানের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র সত্তার উৎসকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে এবং লক্ষ্যের মধ্যে তাকে কল্পনা করে। "সমস্ত কবিতা সময় ও আগুন।" ওই সময় বিস্তার দাবি করে, আর কবিতারও সেই দাবি। "যে স্থান একটি লেখার জন্ম দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, তাকে ভুলে ধরা।" পাসের কাছে কবিতা হচ্ছে, সময় ও কাব্যজনিত বিস্তারের নিখুঁত সমন্বয়। ওই লেখা হল মানবজাতির ভিত্তিমূলকে ক্রমাগত নতুনভাবে সৃষ্টি করা। ওই রচনা গভীরভাবে ঐতিহাসিক। তার মানে এই নয় যে পাস বিমূর্ত, চয়ন ও সরল, একরেখাভিত্তিক ভাবে, জীবন্ত মানুষদের অতিক্রম করে, কোনও তত্ত্ব খুঁজেছেন। বরং তাঁর লেখায় প্রগতি সম্পর্কে মানিক আশাবাদের গভীরতা অনুপস্থিত। "দেবতা, মানুষ ও জন্তুরা একই থালা থেকে খাবার খায়", এবং ঐতিহাসিক তাস্তালের সেই একই থালায় ইচ্ছে করলে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অস্তিত্বের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সেই আহার্য ভাগ করে নেওয়া যায়। 'একাকিত্বের সোলজর্নিয়া' থেকে আমাদের নিষ্ক্রান্ত হতে হবে একাকিত্বের সাধারণ স্বীকারোক্তির পৃথিবীতে। "আমরা একা। সব মানুষের মতই—আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নম্রতা ও অসহায়তা। আর ওই উন্মুক্ত একাকিত্বে আরও আছে সব কিছু পার হওয়ার জাদু—আরও অনেক মানুষের হাত। এই প্রথম আমাদের ইতিহাসে আমরা পা রাখলাম—পৃথিবীর সমকালীন সব মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে।"

এ সব কথায় পাস মেহিকানদের চরিত্রচিত্রণ সমাপ্ত (মুক্ত) করেন। দু'শো পাতা জুড়ে লেখক কেবল বারবার বাঁক নেওয়া ইতিহাসের মৃত অংশকে বাতিল করার ও জীবন্ত অংশকে পুনর্জীবিত করার বিরাট কাজ করেননি। এ যেন সব কিছুকে নেভিগেটর হিসাবে ধারণ করে শূন্য থেকে নতুন করে শুরু করা। আরও বড় কথা, আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন স্পষ্টভাবে বিতর্ক মুদ্দগুলিকে তিনি নতুন ভাবে প্রাণরসে সম্পৃক্ত করেছেন—আদিবাসীদের জগৎ, স্প্যানিয়ার্ডদের বিজয়, ঔপনিবেশিক যুগ, স্বাধীনতা, রিপাবলিকান নৈরাজ্যবাদ, উদারপন্থী সংস্কার, আক্রমণ ও অবক্ষেদ, পজিটিভিস্ট একনায়কতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—এবং সব মিলিয়ে একটি স্বকীয়তা সৃষ্টি করা, যা নিজেকে চেনার মধ্য দিয়ে অন্যদেরও চিনতে শুরু করে। সব মিলিয়ে পাস লিখেছেন, "একটি বই, একটি রচনা মানেই নানা সম্পর্কের জাল।" এ যেন ঐতিহাসিক সমাজের দর্পণ ও অঙ্গীকৃতি। সাহিত্য (যাকে আমরা মনে করি সর্বোপরি সহজ সরল, একরৈখিক, অমর, অবিতর্ক) প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক, নির্ভরশীল, পরিবর্তনশীল, মরণশীল বস্তু। শিল্পও এক আপেক্ষিক, নির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল কাঠামো, যা নিজের নাম ঘোষণার দুঃসাহস রাখে। আরও ভাল, যা সাহস করে নিজের নাম বলে। যা বলা উচিত, নিজেদের নাম, টানাপোড়েনের নামগুলো: স্মৃতি ও কামনা, অতীত ও ভবিষ্যৎ, মরণরেখা ও বক্রগতি। এ সব একত্রিত হওয়ার স্থান, কবিতা। "একটি মুহূর্তকে অমর করা", যে মুহূর্তের মাধ্যমে মুক্ত হয়ে উঠেছে স্মৃতি ও মানবিক আশা আকাঙ্ক্ষা।

সব ক্ষেত্রেই পালের কবিতা সমালোচনামূলক। তাঁর সময় ও তাঁর স্পেস কোনও আবদ্ধ বস্তুর মিথ্যা সম্পূর্ণতার ভাণ করে না, তারা এক স্থায়ী উন্মুক্ততার প্রতিনিধিত্ব করে। ওগুলো হচ্ছে সম্পর্কের, ঘূর্ণনের, প্রয়োজনের এক একটা চিহ্ন, সুতরাং—"মুক্তির এক যৌলিক ও বিদ্রোহী রূপ।" পালের কবিতা পড়া মানে এক সত্য ও মানবিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সে জগৎ পশ্চিমের পজিটিভিস্ট সংস্কৃতির বিরাট অন্তঃ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওই সংস্কৃতি মানুষকে ছোট সীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে: বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তবমুখী এবং আধ্যাত্মিক দোহাইগুলির সঙ্গে যা কিছু খাপ খায় না তাকেই হেয় করে, অবদমিত করে, বিনষ্ট করে। ভুলে যায় শেকস্‌পিয়ারের ভুল বাণী: "হোরাসিও, স্বর্গে ও মর্তে এমন অনেক জিনিস আছে, তোমার দর্শন যা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।" ভুলে যায় পাস্কালের কথা, ('যে বুদ্ধি বা যুক্তি নিজের সীমা জানে না, তা দুর্বল বুদ্ধি')। এবং দেকার্তকেও ভুল পড়া হয়েছে (তিনি কখনওই মেনে নেননি যে অসীম মহাবিশ্বের অপরাপ্ত ও সংশয়তাড়িত সাক্ষ্যে থেকে যুক্তি বর্জিত হতে পারে।): বিজ্ঞিপ্ততা। পালের কবিতা যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তা আদিপর্বেই বিজয়ী বুর্জোয়ার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যবিত্তই আদর্শ, দুই মেরুর মাঝামাঝি সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায়, এই প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিল বাস্তবের পূর্ণতার জিগাকে, যা তীব্র ধাক্কা দেয় এবং ধাক্কা খায়। ব্রেক, কোলরিজ, নোভালিস, হোলডারলিন, নেরভাল, বোদলেয়ার, লত্রেয়ামোঁ—এজাতীয় কবিতা, তাঁরা পুঁজিবাদী জেনারালাইজেশনকে (সব মানুষ সমান) মেনে নেননি। এবং সে সব কবিতার ব্যবহারিক প্রয়োগে তা অস্বীকৃত হয়েছিল। "সব মানুষ সমান হলেও কিছু মানুষ অন্যদের চেয়ে বেশি সমান"। বিমূর্ত সাম্যের বদলে বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষকে দিয়েছিল বাস্তব ঔদাসীন্য (ফরাসি বিপ্লবের প্রথম আইনগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছিল শাপেলিয়ার আইন, যা ঐতিহ্যবাহী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিয়েছিল); এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিনিময়ে হাতে তুলে দিয়েছিল 'আমি'-র সম্বন্ধে মায়াবী ধারণা। স্বার্থপরতার অভিধানগুলো হচ্ছে দীর্ঘ ও বিষণ্ণ মেলোড্রামা যেগুলো শুরু হয়েছে রুশো মার্কা অনুভূতির আবিষ্কার দিয়ে আর শেষ হয়েছে ফ্রয়েডে মার্কা টিভি সিরিয়াল ও মনস্তাত্ত্বিকদের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি দিয়ে। পুঁজিতান্ত্রিক পজিটিভিজ্‌ম মানুষের সঙ্গে বিশ্বের ও মানুষদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের তাগুলোকেই ভোঁতা: ধর্মবর্জিত 'সিমোনি'র (ঘুষ দিয়ে যাজক হওয়ার কৌশল) স্বার্থে মানবিক পৃথিবীর ধ্বংসসাধন।

ওয়াল্টার বেনজামিন তাঁর সুন্দর প্রবন্ধগুলির একটিতে লিখেছেন,—"পৃথিবীতে আমরা প্রতীক্ষিত হয়েছি।" পালের সাহিত্য যেন এই কথাটিই প্রমাণ করে। এ সাহিত্য সময়ের মূর্ত রূপ, স্পেস-এর শব্দচিত্রণ। এই শব্দগুলি থেকেই এ সাহিত্যের পাঠ আরম্ভ হতে পারে। ডিটারমিনিজ্‌মকে খারিজ করে এই রচনা খুলে দেয় আশার ঘরজা। 'আমরা পৃথিবীতে প্রতীক্ষিত হয়েছি': আমাদের আগেই এ পৃথিবী ছিল। কিন্তু আমাদের আগেই এ পৃথিবী ছিল। আর, আমাদের আগে তাকে যতখানি ছিল, পৃথিবীতে আর কিছুই ততখানি ছিল না। এবং যদি আমাদের অস্তিত্বের আগের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তাকে পুনরুদ্ধারের অর্থ তার যোগাযোগের মাধ্যমকে, অর্থাৎ তাকে পুনরুদ্ধার করা। ঐদ্রে ব্রতঁ সংক্রান্ত প্রবন্ধে পাল মন্তব্য করেছেন, "আমাদের সময়ের নয়া পুঁজিবাদ ও মেকি সমাজতন্ত্র মানুষকে নীচে টেনে নামানো সত্ত্বেও মানুষ এক আশ্চর্য জীব, কারণ কখনও কখনও, সে কথা বলতে পারে। তাদের হল চিহ্ন, প্রতীক—তার পতনের নয়, বরং মৌলিক দায়িত্ববোধহীনতার। শব্দ মারফত আমরা হারানো রাজত্ব ফিরে পেতে পারি আর পুনরুদ্ধার করতে পারি পুরনো ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আমাদের নেই। সত্তাতাত্ত্বিকের অনুপ্রাণিত মানুষ যখন কথা বলে, তখন সে কিছুই বলে না যা তার নিজস্ব; তার মুখ দিয়ে কথা বলে স্বয়ং ভাষা।"

সুতরাং এক দ্বৈত অবিরোধ: যাঁচা "একটি অবিরত ঘূর্ণায়মান বর্তমান, এক নৈশ বিপ্রহরে—", যাঁচা "এক

স্থির, অনিঃশেষ বর্তমান এবং তৎসত্ত্বেও অবিরত চলমান" : 'ইতিহাস' বলে যা চালু রয়েছে তার মৃত্যু কি ঐতিহাসিক সত্তার মালিক হওয়ার এক অভিনব উপায় হয়ে উঠবে? ভবিষ্যৎকে কল্পনা করে অতীতকে ফিরে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা? এবং লেখকের ওপর তাঁহার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে স্বীকার করা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সত্তা হচ্ছে যা নৈর্ব্যক্তিক তার সূত্রপাত, আর প্রত্যেক কবিতা যৌথ সৃষ্টি : তারা নিজে তার মাধ্যমে কথা বলতে চায়। (এটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে পাসের শেষ রচনা, 'পশ্চিমা', কবি চার্লস টমলিনসন, ফ্রাঁক কর্মো ও এডোয়ার্দো মার্নগিনেল্লির সঙ্গে যৌথভাবে লেখা।) আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, পাস ঠিক কথাই বলেছেন : এই দ্বৈত স্বাধীনের হচ্ছে টেকনোক্রাটিক একনায়কতন্ত্র (বা সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার) শাসিত দুনিয়ায় আমাদের সত্তা ও আমাদের সম্ভাবনা। এই দুনিয়ার বিশেষত্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ ও প্রযুক্তবাদের নাকচ করা। মূল ব্যাপার হল, (কবিতার জগতে) আমি তোমার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতে পারি বা (কবিতার মতো) তুমি আমার রূপ ধরতে পারো।

শুরুতাতিও পাসের প্রবন্ধগুলো তাঁর কবিতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এমন নয় যে এগুলি কেবল কবিতার সমালোচনামূলক সংযোজন। বরং দুটো মাধ্যমই সমস্ত সমালোচনাকে সম্পূর্ণ চেহারা দেয় এবং একটি প্রতীক ভাগাভাগি করে নেয় : গোঁড়ামিবিরোধী স্বাভাবিকতার ভিত্তিতে মানবিক সমস্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তার, জানার পরিধি বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু যদি পাসের কবিতা তাঁহার সমালোচনা হয়, তাঁর প্রবন্ধ বিশ্বের সমালোচনা, অথবা বলা ভাল, যে সমস্ত কাঠামোর ভেতরে তাঁরা নিজেকে প্রবিষ্ট করায়, তার সমালোচনা। এই সব কাঠামোগত ঐক্য, পাসের রচনায় না নিজ সত্তা, না রাষ্ট্র, না জাতি, না আত্মা, না ঈশ্বর, কোনওটাই নয়। সংস্কৃতির বিতর্কিত বা ভাসা ভাসা ধারণা না হয়ে বরং স্পন্দন ও সংঘাতের যোগফল। (ঐতিহ্য ও ভাঙন, বা ভাঙনের ঐতিহ্য) যাকে আমরা বলি সভ্যতা। এ জগৎ যেন দুর্বল, সহাবস্থান, সভ্যতার বিভিন্ন রূপের অদলবদল ও অনুসন্ধান। কিন্তু টয়েনবি বা স্পেংলারের সরলরৈখিক ধারায় নয়, তাঁর বরং মিল আছে লেভি স্ট্রাউস বর্ণিত মিথলজির সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে বৃত্তাকার বা বক্রাকার রূপে বর্তমানই চিরন্তন। সভ্যতা যেন ভাষার ও ভাষা যেন সভ্যতার সৃষ্টি। আমার মনে হয়, পাসের রচনায় আমরা যত বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা পাই তেমনটি একালের অন্য কোনও স্প্যানিশ ভাষার সাহিত্যিকের লেখায় বিরল। সভ্যতার তীর্থযাত্রী রূপে প্রাবন্ধিক পাস সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র বিরাট রচনা : 'যোগাযোগ ও বিচ্ছিন্নতা' : দুই পক্ষের মুখোমুখি হওয়া, সংঘাত, একীকরণ, ঐক্য ও বৈচিত্র্য—এ সবই সভ্যতাসমূহের, বাস্তবিক, চালিকা শক্তি। মেক্সিকোর পুত্র; লাতিন আমেরিকার ভাই; স্পেনের সৎপুত্র; ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালির পোষ্যপুত্র; জাপান ও ভারতের প্রিয় ও পরিচিত অতিথি; আর (আমাদের সবার মতো) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জারজ সন্তান, পাস সভ্যতার সমস্ত যোগসূত্রের প্রতি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। পাস সেই ছোট শ্রেণীর একজন (তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্প্যানিয়ার্ডও আছেন : খের্হা, মুহুয়েল, গয়তিসোলো) যাঁরা প্রমাণ করেন, কাফ্কিনের সাংস্কৃতিক 'সেটো' চিরন্তন নয়। এই প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে : 'গোড়াপত্তনের সাহিত্য' ও 'বিজয় এবং উপনিবেশ'। এই দু'টি রচনা আমাদের দেখায়, কী আন্তরিকতা ও জটিলতা নিয়ে পাস আমাদের স্প্যানিশ উত্তরাধিকারজনিত সংঘাতের সমীপবর্তী হয়েছেন। "আমরা ইউটোপিয়ার ইতিহাসে এক অধ্যায়"; তার অর্থ, আমরা শব্দের কথার সন্তান; সৃষ্ট হওয়ার আগেই আমরা ছিলাম কল্পিত (আকাঙ্ক্ষিত) সত্তা। বরাবর নিজেদের প্রশ্ন করেছি, 'আমরা কি নিজেদের বানানো ইউটোপিয়ার শিখরে পৌঁছেছি?' আজ প্রশ্ন করতে শুরু করেছি, 'এমন কেউ কেন ছিল না যে কল্পনা করতে পারত, আমরা তারই স্বপ্নলোকের শিখরে উঠেছি? 'আমরা স্প্যানিশ কাউন্টার রিফর্মেশনের এক ভিত্তি; তার অর্থ, আমরা একটু খাপাটে, মূল ধারা থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। সাধারণত

আমরা আধুনিকতার রোমাঞ্চকর জগতে পদার্পণ করি আর কারোর হাত ধরে। স্তালিনিস্ট পার্টি, মাউনহাউৎজ ও হিরোশিমার পর এই অ্যাক্তেকারও, অপরাধের পথ ধরে, ঘুল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ নির্দোষ নয়। যাকে আমরা চিনতেও পারি না, কেবল সেই মন্দ। আগের আমলের কর্তারা আজ তেমনই ঝাপাটে যেমন আমরা অন্তরা চিরকাল ছিলাম। আজকের দিনে ঝাপাঝাপি সরলতা ও সত্তার কেন্দ্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য। আমরা 'সব মানুষের সমবয়সী সাথী'। গায়ের জোরে সামরিক মেরু-করণের মাধ্যমে নয়, অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অস্ত্রায় বণ্টনের মাধ্যমে নয়, নৈর্ব্যক্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমেও নয় ; আমরা যে কারণে সৃষ্ট হয়েছিলাম, সেই কারণেই সাথী : নিজেদের সঙ্গে কথা বলার জন্ত পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলতে হবে ; আবার পৃথিবীকে নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

পাসের প্রবন্ধে আমাদের কথা মূর্ত রূপ লাভ করেছে, কারণ দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। এই বিশাল ও বেধাহীন চলাচলের পথে বুড মার্কেসের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং দু'জনের সম্পর্ক তৈরি হয় গদোরা ও মিশ'র সঙ্গে ; প্রেসিয়া তেওতিউয়াকানে একটা চিহ্নের রেখা পান, আর স্প্যানিশ বিজয়ীদের সোনা পরিণত হয় প্রাচীন হিব্রুদের পাথরে ; ব্রেকের শব্দের জগৎ সৃষ্টি করে মালার্মের জগতের শব্দ। প্রতীকগুলি সব আবর্তিত হয়। মানুষের ইতিহাস একটাই। তাকে ধারণ করে, সহ্য করে ও উপভোগ করে এক আদিম ও অন্তিম যৌথসত্তা, এক প্রিয়, স্বাভাবিক মানুষ, যে পৃথিবীর উৎস ও সমাধান। পাসের গদ্যের ছন্দ, মন্থরতা, কর্কশতা, শেষ অবধি, আদিরসের সঙ্গে যুক্ত ; শব্দ বিশ্রাম নেয় শরীরে, সত্যতার শেষ বেদিতে। শরীর আর শব্দ, বহুক ও বীণা : সময়ের মূর্ত রূপ, লেখার পটভূমিকা, যে ভাষা আগে থেকেই আছে তার পথ খুলে দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়া, যে সত্যতা মরণশীল অথচ যার চিত্রণ সম্ভব তারই ভেতরে মানুষের আপেক্ষিক অবস্থান এবং সর্বোপরি মানুষের মুক্তি, যা তাকে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আর বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে : এক "সত্তার দিকে হাত বাড়াই যে সত্তা পরিবর্তনশীল, নিজের থেকে মুক্তির দিকে নয়।"

অনুবাদকের টীকা :

বাইবেলে ইজরি বীর জন্তরা ঈশ্বরের বরে সূর্যাস্ত ঠেকিয়েছিল। যাতে আলো থাকতে যুদ্ধ জয় করতে পারে।

ফ্রান্সে ১৮৩ -এর বিপ্লব জুলাই বিপ্লব নামে পরিচিত।

১৯১০-এ মেক্সিকোর বিপ্লবের নেতারা ছিলেন পাকোভিইয়া ও এমিলিয়ানো সাপাতা।

১৯১৭-র অক্টোবরে পিটার্সবার্গের শীতকালীন প্রাসাদ দখল ছিল রুশ বিপ্লবের সূচনা।

মাও জে দং-এর নেতৃত্বে চীনা কম্যুনিস্টদের লং-মার্চ।

১৯৭১-এর পারি কমিউন ছিল বিশ্বের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র।

চে গেভারা বলিভিয়ায় নিহত হয়েছিলেন।

পাতাল সভ্যতা পত্রাবলীর ক্ল্যাসি হার্শনিক, রেকার্ডও তাই।

এক যে ছিল অনিতা

অমৃতা প্রীতম

শিশুটিকে দেখতে দেখতে ভাবনার অতলান্ত জল থেকে উঠে আসে অনিতা। ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলেই কিন্তু ওর মনে হয় যেন ও নারী নয়, তামার তোলোর পর যন্ত্রণায় ছটফটানো একটা মাছ। আবার নিজের শিশুটির দিকে তাকায় অনিতা, আর ধীরে ধীরে প্রশান্তি ছেয়ে আসে মনে, যেন খাবি খেতে থাকা মাছটাকে কেউ ফেলে দিল আবার জলে। আরামে নিঃশ্বাস ফেলে ও, কিন্তু এবার মনে হয় যে মাছ তো নয়, অসহায় নারী ও, এমনই এক নারী যে নদী। সত্যিই গভীর জলে পড়েছে।

অনিতা ভাবে, আমি তো না মাছ, না পাখি, না পশু, আমি কী তাহলে—ওর চোখ বুজে আসে।

অনিতার স্বামী ঘরে ঢোকে, ওর কপালে হাত রাখলে, কেঁপে উঠে চোখ মেলে অনিতা। ওর সাহস হয় না স্বামীর চোখের দিকে তাকাতে। ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজতে যাবে, তখনই এক অদ্ভুত চিন্তায় ওর স্নায়ু সব কেঁপে ওঠে। বিছানার চাদরের একটা কোন টেনে অনিতা শিশুটির মুখ আড়াল করে, যেমন সুন্দর জিনিসকে আড়াল করা হয় নজর তাড়াবার জন্য, বা যেমন করে কোন কুৎসিত মানুষ নিজেকে আড়াল করে অন্যের বিদ্রূপ এড়াতে। অনিতার ক্লান্ত মন এই বিপরীত দুই সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে থাকা বিশাল খাদটিকে পার হতে অক্ষম হয়ে, চোখ বোজে আবার।

ওর যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত শরীর ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে যেই একটু আরাম পেয়েছে, ও হঠাৎই দেখে এক মহিলা ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে ওর বিছানার পাশে। অবলভাবে ও দেখলো যে আগন্তুক ওর বাচ্চাটিকে দোলনা থেকে তুলে, তীব্রগতিতে পালাচ্ছে।

বিদ্যুতচমকের মত শক্তির প্রবাহ খেলে যায় অনিতার দেহে, ও ছোটে মহিলার পেছনে। 'আমার বাচ্চা' ও আর্তনাদ করে উঠে।

পলায়নরত মেয়েটি দৌড়োয় একটি কথাও না বলে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে। এলোমেলো চুল ওড়ে। অনিতার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ও তা কাটিয়ে উঠে। রক্তের মধ্যে, শিরায় শিরায় আতঙ্কের এক গরম রেখা ফেলে যায়। কোনোমতেই ও যেন মেয়েটিকে চোখে না হারায়।

অনিতা এখন পৌঁছেছে এক বিজন এলাকায়, নজরে না পড়ে কোন গাছ না কোন ছায়া। কোনোমতেই যেন ও মেয়েটিকে না হারায়। ওর পা বসে যায় নরম বালিতে—মেয়েটিরও, আর দুজনেই টালমাটাল পায়ে দৌড়ায়, হাঁপায়, নিঃশ্বাস টানে। বাচ্চাটি কেঁদে ওঠে। হয়ত অন্য মেয়েটির হাতের চাপে ওর কষ্ট হয়েছে। নয়ত খিদে পেয়েছে খুব। মেয়েটি থমকে যায়, ঘামে, ও বাচ্চাকে আদর করতে থাকে।

অনিতা দেখে—সে মেয়েটি ব্লাউজ খুলে বালির উপর বসে পড়ে, ও বাচ্চাকে বুকে টেনে দুধ খাওয়াতে থাকে। হাত নেড়ে সে অনিতাকে চুপ করে থাকতে বলে যাতে বাচ্চাটির খাওয়ার ব্যাঘাত না হয়। কি নিশ্চিন্ততায় দুধ

খেয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটি, অনিতা চেয়ে থাকে। স্তিমিত জ্যোৎস্না বাচ্চার বাঁ গাল উদ্ভাসিত করে, অনিতা দেখে দুধের এক ধারা ওর ছোট্ট ঠোঁটদুটি থেকে গড়িয়ে পড়ছে।

'বলবে না?' মেয়েটি আস্তে করে বলে, অনিতাকে ডাকে তার পাশে বালির উপর।

ক্লান্ত পা দুটি নিস্তেজ, অনিতা প্রায় চলে পড়ে।

'আমাকে ডাকছো কেন? আমরা তো শত্রু নই, আস্তে করে বলে মেয়েটি। শিশুটির মাথায় আদরে হাত বুলিয়ে চুল বিন্যস্ত করে।

অনিতা রেগে ওঠে—'আমার বাচ্চা নিয়ে পালালে কেন তুমি?' ধীরে ধীরে নিজের হাত-পায় শক্তি যাচাই করে, বাচ্চাটাকে মেয়েটির থেকে কেড়ে নিয়ে পালাতে পারবে তো ও?

মেয়েটি স্মিতমুখে বলে—'কি বললে তুমি?'

'বলছি, আমার বাচ্চাকে নিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?'

'কারণ এ তো আমারই'

'না, ও আমার'

'তর্ক করো কেন অনিতা, যখন তুমি ভালই জানো যে এ আমার।' 'আমার এই বিধ্বস্ত, ক্লান্ত দেহটিকে জিজ্ঞেস করো, যে কোনো ধাই-কে ডাকো, তারাই বলে দেবে যে এই শিশু আমার।' 'কারোর জবানবন্দির দাসত্ব না আমার।' মেয়েটি অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, অনিতাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে। 'আমার কাছে কারোর কথার কোনো দাম নেই।' 'তাহলে?' অনিতা অবাক—'আমি চাই তুমি নিজেই স্বীকার করো এ কথা। এটা ঠিকই যে যন্ত্রণায় তোমার শরীর বিধ্বস্ত। কিন্তু আমার হৃদয়? সেখান থেকে যে অঝোরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাকে দেখে?' অনিতা সগর্বে বিজয়ীর হাসি হাসে 'রক্তমাংসে তৈরী হয় শিশু, শরীর তাকে জন্ম দেয়, হৃদয় দেয় না' মেয়েটি হাসে, 'যদি তাই সত্য হয়, তোমার স্বামী যখন আজ রাত্রে শুনে দেখতে এলো, তুমি ওর মুখ আড়াল করলে কেন?'

অনিতা মুখ ফিরিয়ে নেয়, জ্যোৎস্নায় তাকিয়ে দেখে বাচ্চার মুখ। ও প্রশ্ন করে, 'তুমি বাচ্চার মুখ দেখেছো? দেখেছো ওর চোখ ঠোঁট।'

'কেন? ঘরে থেকে জন্মেছে আমি তো তাকিয়েই থাকি। চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না'—মেয়েটি বলে বাচ্চার মুখ ফিরিয়ে দেয় চাঁদের আলোয়। দুধ খেয়ে শিশুটি পরিতৃপ্ত, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। 'তুমি ওর মুখই দেখোনি' অনিতা বলে, শিশুটির কাছে এগিয়ে আসে 'এই তীক্ষ্ণ নাক, চওড়া কপাল, ছোট্ট গোল চিবুক, ওই আয়ত চোখ···ঠিক যেন'—অনিতা আনমনা হয়ে পড়ে।

'বলে যাও, ঠিক যেন—কে?'

মেয়েটি উলকে দেয়, 'এখন কথা বলছো না কেন?

'ঠিক যেন—সাগর!' অনিতা বলে ফেলে। মেয়েটি হেসে গড়ায়, অনিতার হাত ধরে, নিজের বুকি বোঝাতে থাকে। 'তুমি নিজেই জানো যে তুমি আজ অবধি সাগরকে স্পর্শ করনি।'

'সেটাই তো আমাকে অবাক করছে'

'তাহলে বলো, কোন বিজ্ঞানে সমর্থন করে যে শরীরের সঙ্গে শরীরের মিলন ছাড়াই একটি বাচ্চার জন্ম হয়?'

'না, তা অবশ্য করে না।'

'বিজ্ঞানের যুক্তিতে এই শিশু তো কেবলমাত্র তোমার স্বামীরই হতে পারে। এ-ব্যাপারে সন্দেহের ঊর্ধ্বে—'

'কিন্তু এর চোখমুখ ?'

'সে তো সাগরের !'

'নিজেই দেখে নাও।'

'এটা যদি মেনেই নাও, তাহলে এও মানো যে এই শিশুকে গড়েছে তোমার দেহ ততটা নয়, যতটা তোমার হৃদয়। শিশু তো জন্ম নেয় দেহের থেকেও বেশী, আত্মা থেকে।'

'হয়ত—'

'তাহলে আমার সাথে ঝগড়া করো কেন ? ঝগড়া করো কেন নিজেরই আত্মার সাথে ?

'না। আমার তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়া নেই। মানছি এ আমার থেকেও বেশী, সন্তান। কিন্তু তুমি একে নিয়ে যাচ্ছো কোথায় ?

'কোথায় যেতাম আমি ? আমি তো শুধুই চাইছিলাম সাগরকে ওর মুখটা ক্ষনিকের জন্যে দেখিয়ে আনতে।'

নিদ্রিত বাচ্চার ঠোঁটে চুমু খায় অনিতা, তার চোখের জল ঝরে পড়ে ওর কপালে। 'দুনিয়া জেনে কোনোদিন সাগরের সন্তান বলে ডাকবে না। সাগর নিজেও কোনোদিন তোকে আপন বলবে না···

অনিতা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠলো। ধাই বিছানার পাশেই ছিলো, বলছিলো, এই অবস্থায় কোনো মেয়েকেই ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। দেখ তো, বেচারা ঘুমের মধ্যেও কাঁদছে।

সারা দিনমান দুঃস্বপনের রেশটা অনিতার মনে ভার করে রইল।

তারপর আরেকটি রাত নরম করে গাঢ় আঙুলের সোহাগ ভরে সেই ভার নিলো সরিয়ে। আর অনিতার বিগত জীবনের দিনগুলি জীবন্ত হয়ে এলো তার চোখের সামনে।

কবে যে সময়ের ঘড়িটা ওর যৌবনের প্রাসাদে টিকটিক করতে করতে তার মনের লয়টা হারিয়ে ফেলেছিলো, তাও জানলোই না। ও বুঝলো শুধু যে গতিটা অনন্তর দ্রুত হতো রাতে ও চিমেতালে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলতো সমস্ত অন্তহীন দিন ধরে। দিনগুলো ওকে স্বাভাবিকের চেয়ে শতগুণ ক্লান্তি এনে দিত, ও তারপরই নেমে আসত রাত্রি। অনিতা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ত না, ঢলে পড়ত অবসন্ন হয়ে। আর ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার আগেই, যে বিশ্রাম দরকার তার এক শতাংশ পাবার আগেই আবার নতুন দিন এসে পড়ত। ও যেন আর নড়তে পারত না, বিছানা থেকে নিজেকে হিঁচড়ে বার করতে হতো।

সময়ের ঘড়িটাকে ও নিয়ম মত দম দিতো। ভোরে উঠে স্বামীর জন্য চা বানাতো, দুপুরে তার খাবার সময় মত পাঠিয়ে দিয়ে, সেলাই নিয়ে শাশুড়ী মনদের সঙ্গে বসত। রাতে খাবার টেবিলে বসে শুনতো ওর কন্ট্রাকটর স্বামী বন্ধুদের সঙ্গে বিরক্তিকরভাবে আলোচনা করে যাচ্ছে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও কুলীদের হাঙ্গিবাজী ও হুঁজ্জুতী নিয়ে। শুনতে শুনতে কেমন একটা স্যাতসেঁতে ভাব ওর পায়ের তলা দিয়ে ছুঁইয়ে উঠত। স্যাতসেঁতে ভাবটা ঊর্ধ্বগামী, ওর শরীর বেয়ে উঠত, হাঁটুর মধ্য দিয়ে সারা শরীরে, জিভে তারের মত বসত, কানে ঢুকে, শেষ পর্যন্ত ঝাঁঝিয়ে বসতো ওর কপালের সমস্ত শিরাগুলিতে—ধীরে ধীরে অনিতা খুব একটা কথা বলতে আর পারতো না, শুনতেও পারতো না তেমন।

বিহার আহারেতে যাচ্ছে। বিহার খুব প্রগতি করছে। এসব কথা শুনে ঝুঁতোও না আর। ওর এখনো মনে পড়ে যে দিন ওর মাথা ব্যথা করছিলো প্রচণ্ড, ও বিছানায় শুয়ে ছিলো, আর শাশুড়ী জিজ্ঞেস করছিলেন

যে ওর কোথায় ঠিক ব্যথাটা লেগে গিয়েছে।

কথা বলতে চাইলেও ও পারছিল না। তবে তা বাধার জন্য নয়—অবসাদ, ওর সমস্ত জীবনের হতাশা ওকে মূক করে দিয়েছিলো। শাশুড়ী পেট ব্যথা হচ্ছে ভেবে কয়েকটি ব্যথার বড়ি ওকে দিয়ে গেলেন। ও নিঃশব্দে বড়িগুলি খেয়ে নেয়।

অনিতার যে ওর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলো এমনও নয়, তার আত্মীয়দের সঙ্গেও কোন অশান্তি ছিলো না। এ যেন প্রচণ্ড হাওয়ায় বেলাশেষে এক অভিযাত্রীর নৌকা অচিন দ্বীপে গিয়ে ঠেকেছে। সে না অধিবাসীদের ভাষাকে চিনতে পারছে, না বুঝতে পারছে তাদের ভাষা; সেখানে সে শুধুই হতবাক হয়ে চারদিকে অপলকে চেয়ে দেখছে। আর অনিতা এও জানত যে বিবাহসূত্রে বেচ্ছাচারী হাওয়ায় যাদের যখন কোন কুমারী মেয়ের নৌকা গিয়ে যে কোন অচিন দ্বীপে লাগে, সে কিন্তু সেখানেই চিরকালের জন্য আটকে পড়ে। তার যে তাঙা থেকে নৌকা সরিয়ে নিতে যানা, অন্য কারোর চিন্তায় বিভোর হয়ে বৈঠা দুটি যে চালাবে, তাও না। তাই অনিতা কোনোদিন বৈঠাদুটির দিকে তাকালোও না।

শুধু যখন ও রাত্রে ঘুমিয়ে থাকত, দেখত যেন ও ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে উঠে যাচ্ছে। দেওয়াল ধরে ধরে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলোমেলো ভাবে ঘুরছে সব রাস্তাঘাট ও বন্ধ গলির মাঝে। লোকালয় পড়ে থাকত পেছনে, আর ও এসে পৌঁছোতো এবড়ো-খেবড়ো হাঁটাপথে; তারপর ক্ষেতের মধ্যে আলপথে, নির্জন সমতলভূমির ধূসর ধূলায়। তারপর, ক্লান্ত, ও হঠাৎ, দেখতো যে শহরের লোকেরা ওকে তাড়া করেছে। খালি পায়েই দৌড়োতে থাকতো ও। তাড়া করে আসা মানুষজনের কোলাহল বাড়তেই থাকতো, আরো তুমুল জোরে—আরো কাছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ও এক জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছোয়। পেছনের তাড়া করতে থাকা লোকেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, ও শুনতে পায়, তারা বিদ্রূপ করছে! 'এবার পালাবে কোথায়?' থমকিয়া হয়ে অনিতা তার একটি পা রাখে নদীর বুকে—আর অবাক হয়ে দেখলো যে তার পা শক্ত জমিতে পড়ছে, যেন সে এইমাত্র একটা কার্পেটের উপর পা রেখেছে—এমন নরম ও ঠাণ্ডা সে স্পর্শ। সে অন্য পা বাড়িয়ে যেন হেঁটে যায় জলের উপর দিয়ে। পিছনে নদীর কিনারায় তাড়া করে আসা ভীড় রয়ে যায়, কেউ জল পেরিয়ে ওকে ধাওয়া করতে সাহস করে না—ও সবাইকে এড়িয়ে পালিয়ে আসে···আর হাঁটতে থাকে···

অনিতার মনে পড়ে যে ও কেমন করে জেগে উঠেও নিজের পা ছুঁয়ে দেখতো তারা নদীর জলে ভেজা কিনা। ওর পায়ে কোনো জল থাকতো না, রাস্তায় কোনো ধুলোও না।

প্রথম-প্রথম ও চমকে গুঠত এই সব স্বপ্ন দেখে, বিবাহসূত্রে এক বিশাল আবর্ত ঘিরে ফেলতো তাকে। এমন মনে হতো যেন এক দেহেই ওর দুটি অদ্ভুতভাবে ভিন্ন মন আছে। ও যেন একটি নারী নয়, ওর মধ্যে রয়েছে দুটি পৃথক নারীসত্তা। একজনের নাম অনিতা, বর্ণপ্রকাশ আমলের কন্যা, রাম পাল সচদেবের বিবাহিতা স্ত্রী। ও হিন্দু ভারতের নাগরিকা, প্রচুর বিধিনিষেধে বাঁধা। অন্যজনের নাম শুধুই নারী, ধরিত্রীর কন্যা, যে তার স্বামীরূপে পেতে চায় মুক্ত আকাশকে। প্রেম তার ধর্ম, এই বিশাল পৃথিবী তার ঘর ও সে নিজের অনন্ত এই সন্তান যাত্রাকেই একমাত্র বিনয় মেনে চলে।

অনিতা ক্রমশ এই স্বপ্নে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলো। অনেকগুলো জিনিসের মত এটাও এক কঠিন যেন—যেমন ওর ভোরের স্নান সারা, দিনের রান্নাবান্না, ও স্বামী রাত্রে আহ্বান করলে তার বিছানায় যাওয়া।

তারপর এক স্বপনের বিস্মৃতি ঘুমে থাকতো। আবছাভাবে ও অনুভব করতো যে একটা মূর্তি যেন জলের

উপর দাঁড়িয়ে আছে। চেনা যাবে, এত কাছে ও কোনোদিন যায়নি। অনিতা ধীরে ধীরে চওড়া পিঠ ও লম্বা দেহ দেখে—মূর্তিটাকে চিনলো। যতক্ষণে ও মুখটা দেখবে, স্বপন ভেঙে যেতো। আরও বিস্তৃতি হলো স্বপনের। ও মূর্তিটাকে কথা বলছে শুনতে পারতো—যেন কেউ নিজের মনে পড়ে চলেছে। ও বুঝতে পারতো না কি পড়া হচ্ছে—চিঠি, না গান বা প্রার্থনা, কারণ কোনো কথাই ওর কানে পৌঁছোত না। কেবল সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর—গম্ভীর, যেন পাহাড়ের গর্ভ থেকে জল বেরিয়ে আসছে।

তারপরই ব্যাপারটা হলো। একটা পার্টিতে গেছিল ও—শুধু পেছন থেকেই দেখে পুরুষটিকে। অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার পিঠের দিকে। আমন্ত্রিত লোকজনেরা লোকটিকে গাইতে অনুরোধ করলে সে একটি ছোট্ট গান করে। তার নাম সাগর। অনিতা জোরে ঠোঁট কামড়ায়, পরখ করে সে স্বপ্ন দেখছে না তো! না, সে তো জেগে। সেই এক গম্ভীর, গভীর মন্দ্র, কণ্ঠস্বর, যেন পাহাড়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসছে ঝরনা। আর মুখটা দেখার পর থেকেই সেটা ওর স্বপ্নে ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। সাগরের নামে সে অভিসিক্ত করে তার স্বপ্নের মূর্তিকে।

এর পর থেকেই, যখনই এক অনিতা তার স্বামীর পাশে বসে থাকতো, অন্য অনিতা থাকতো সাগরের সাথে। অবশ্য এটা আলাদা ব্যাপারই যে রক্তমাংসের অনিতাকে সবাই দেখতে পারত, কায়াহীন অনিতা তো অদৃশ্যই থাকত।

প্রথম প্রথম, দুই অনিতার খুব মতভেদ হতো। অনিতা খুব ঝগড়া করতো, লম্বা লম্বা তর্কে জড়াতো, আর অন্য অনিতা হেঁসে ভাসাত, বা খুব হাসত—কিন্তু সবই নিঃশব্দে। তবে এই দ্বিতীয় অনিতা এত কোমল হৃদয় ছিলো, এত চোখের জল ফেলতো আর মৃদু স্বরে কথা বলতো, যে প্রথমা অনিতার মনে তার জন্যে স্নেহ উথলে উঠত। ওরা একে অপরের সঙ্গে বসে থাকতো সহৃদয়, সমব্যথী বন্ধু যেন। এই রকম বসে থাকতে-থাকতে ও একবার বলেছিলো—

'বলো তো, এই সাগরের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'জানি না।'

'ও তো কিছুই না।'

'হ্যাঁ, হয়ত তাই, কিছুই না।'

'হয়ত কেন?'

'কারণ আমার মনে হয় যে ও আমার সব কিছু, সর্বস্ব।'

'তোমাকে একটা কথা বলবো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ, যে কোন অধিকারই জন্ম নেয় একটা সম্পর্ক থেকে, আর এই সম্পর্কের উৎপত্তি হল দেহে।'

'হ্যাঁ, কেন।'

'তোমার কোন দেহ নেই। এই দেহের উপর আধিপত্যও আমার, কেন না আমি তোমার ঘর। যতক্ষণ আমি বেঁচে, তুমি এই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না।' 'মানছি আমার দেহ নেই, আমি কায়াহীন। দেহের তো দুটি পা থাকে, যারা সামনে পথ খুঁজে নেয়, আর পথ তাদের নিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।'

'তাই তো বলছি আমি। তোমার তো গন্তব্যই নেই।'

'নেই হয়ত।'

'আবার সেই কথা—হয়ত। সব কথাতেই হয়ত বল কেন? আমার ভয় লাগে তোমার হয়ত শুনলেই।'

'তুমি ভয় পাবেই বা কেন?, 'আমার ভয় হয় যদি তুমি আমার ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো।'

'ভাবছ আমি তোমাকে এই দেহের উপর আধিপত্যের থেকে বঞ্চিত করবো? আর এই দেহের আকর্ষণেই সাগরকে পাবো?'

তোমার বড় আস্পর্ধা হয়েছে তো!'

'কিন্তু তুমি তো ভালো করেই জানো যে তোমার জিভের ক্ষমতা আমাকে ধার না দিলে আমি বোবাই থেকে যাবো। মানুষ জিভ দিয়ে তো কথা উচ্চারণ করে, কথাগুলি তৈরি করে মনে—আর সব কথাই তো তোমার অধিকারে।'

'আমি কোনোদিন তোমার কথা ধার নেবনা;

সেদিনের যে কথাবার্তা অনিতা খুব স্নেহের সঙ্গে শুরু করেছিলো তা কিন্তু মনোমালিন্যে শেষ হলো। কয়েক দিন ধরে সে অন্ধ অনিতার সঙ্গে কথা বললো না। তবে আরেক দিন সে অন্ধ অনিতাকে কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করলো।

'তুমি সারাক্ষণ বোবার মতন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকো কেন?'

'বলেনা, মা-বোনেরা বোবার ভাষা বুঝতে পারে। আমার হয়ত কেউই আপনার নেই, তবে তোমাকে আমি নিশ্চই একান্তই নিজের বলতে পারি।

'তুমি চাও কী?'

'আমি ভাবি, তুমি যদি একবারটি সাগরকে এখানে আনাতে পারতে।'

'তুমি ওকে বলবেটা কি?

কিছুই না। কারণ আমি যে কিছু বলতেই পারি না। আর আমি জানি যে তুমি আমার তোমার কোন কথাই ধার নেবেনা।'

'তাইলে সাগরকে দেখার লাভটা কী?'

'চাঁদ-সূর্য দেখেই বা কারোর কি লাভ হয় বলো?

'হাতে তো আর চাঁদ-সূর্য ধরা যায় না।'

'যাদের হাত আছে তারা মাথা ঘামাক এ নিয়ে। আমার তো হাতও নেই।'

ও নিজের হাতের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে অন্ধ অনিতাকে লাগাল।

'এক মুহূর্তের জন্যেও এটা ভেবনা যে আমি কোনোদিন তোমাকে এই হাত দুটো ধার দিয়ে বসবো।'

'আমাকে এত ভয় পাও কেন? কখন কী আমি তোমাকে কোন অপ্রিয় করেছি?

'ঠিক আছে। সাগরকে আমি এখানে এক বার আনবো। শুধু একবারই। আর কখনো, কোনোদিনও নয়।

'যা তোমার ইচ্ছা।'

একটি মেয়ে : পানপাত্রে-সুরা

অমৃতা প্রীতম
অনুবাদ : সোমাবন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন নন্দার এই কাহিনী আমি গত বছর লিখেছিলাম। ওর প্রদর্শনী দিল্লীতে চলছিল তখন। পুরো সপ্তাহ ধরে, প্রত্যেক দিন—কোন না কোন কাগজে ওঁর অদ্ভুত কৃতিত্বের আলোচনা হতো। প্রখ্যাত সব লোকজন—বিদগ্ধ কলা রসিকেরা এই সব প্রদর্শনের আলোচনা করতেন। আমার জ্ঞান অতি সীমিত। চিত্রকলা সম্বন্ধে ততটুকুই জানি, যতটুকু একজন শিল্প-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিন্তু সুস্থ অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের হতে পারে। প্রদর্শনীতে অপূর্ব সব ছবির মুগ্ধ তারিফ করতে করতে আমার চোখদুটি সুরেনের দুটি ছবির উপরেই আবদ্ধ হয়ে রইল। একটির নীচে লেখা ছিল 'আড়াইপাতা হেড়পাতা' ও অন্যটির নীচে 'একটি মেয়ে : পানপাত্রে সুরা'

প্রথম ছবিটি ছিল চা-বাগানে পাতা তুলতে থাকা পাহাড়ি মেয়েদের, ও ছবিটির মানে শিল্পী এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন :]

চা গাছের শীর্ষে হেড়খানা পাতা থাকে—একটা পুরো বড় পাতা, আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকা ছোট বাচ্চা পাতা। এই হেড় পাতার চমকই আলাদা। এই পাতার একটু নীচে গজিয়ে থাকে আড়াই পাতা—খুব নরম। আর তার নীচে মোটা মোটা, কর্কশ পাতার কিছু শাখা। আড়াই ও হেড় পাতাদের আলাদা ছিঁড়ে রাখা হয় সযত্নে। এই পাতার যে চা হয়, তা ভীষণ দামী, খুব দামে বিকোয়। এই আমরা যে চা কিনি, সে হচ্ছে নীচের লম্বা, কর্কশ পাতার। একটা আস্ত গাছ থেকে মাত্র চারটে ছোট পাতা সংগ্রহ করা যায়, এখন ভাবো সমস্ত বাগান থেকে কতই বা পাতা পাবে? এই চা বড় দুষ্প্রাপ্য, খুব দামী, ষাট টাকা পাউণ্ডের বেশি দামে বিকোয়।

সুরেন নন্দার এই ছবিতে যে প্রথম মেয়েটি, সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে, তার মুখের আধখানারও কম দেখা যাচ্ছে। আমাদের সামনে দেখানো ওর পিঠ, তাও কি মোহময়ী, অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতিমা। মনে হচ্ছিল, অন্য সব পাহাড়ী মেয়েরা যেন এক বিশাল চা-গাছের শাখা-প্রশাখা, আর এই মেয়েটি, এই যে এই কাছে দাঁড়িয়ে, এ সম্পূর্ণ গাছটার অস্তিত্ব সেই হেড়খানি পাতা ছোট্ট, নরম, উজ্জ্বল কিশলয়! কিন্তু এই সব চিন্তা আমি মনেই রাখলাম, শিল্পীকে কিছুই বললাম না।

অন্য ছবিটি, যার নীচে লেখা ছিল "একটি মেয়ে : একটি পানপাত্রে সুরা"। এও এক পাহাড়ি কন্যার অদ্ভুত সৌন্দর্য ছিরে গড়ে উঠেছিল। লোকে একেই বোধহয় বলে 'ছবিটা যেন কথা কয়ে উঠবে।' সত্যি এমন জীবন্ত ছবি আমি কখনও দেখিনি। শিল্পী মুক, চুপচাপ, ছবির বিষয় কিছুই বলছিলেন না। আমিই এগিয়ে বললাম "এমন সুরাপাত্র শেষ করতে তো একটা সম্পূর্ণ জীবনও পর্যন্ত নয়।'

শিল্পী চমকে আমার দিকে তাকালেন। ষাটের কোঠায় বয়স মনে হল। এক অদ্ভুত তারল্য যেন তাঁর চোখে ভেসে এল। বললেন, এই চিত্রের এমন ব্যাখ্যা আমি তো আর কারো কাছে পাইনি। এ তো আমারই

অন্তরের কথা, ঠিক যা আমি এখানে বলতে চেয়েছি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এমন গভীর অর্থ খুঁজে পায়নি। আমার সাথে তো অনেকে ইয়ারকী করেছে "একটি মেয়ে একটি তরা সুরাপাত্র··· যারে পাত্র তো বোজই ভাঙছো, নতুন হবে।"

কে জানে ছবিটাতে কী অমোঘ আকর্ষণ ছিলো। সপ্তাহব্যাপী সেই প্রদর্শনীতে আমি তিনবার গেলাম— অবশ্য অন্য কোন ছবির জন্য নয়, শুধু ওই ছবিটাই 'একটি মেয়ে : তরা সুরাপাত্র। কোনো শিল্প-বোদ্ধা হিসেবে নয়, শুধু মনে আবেগের তাড়নায় আমি নন্দা-কে ওঁর ছবির সম্বন্ধে এই সরল, মন থেকে উঠে আসা কথাটি বলেছিলাম। আর সেই কথাটি যেন শিল্পীর সমস্ত, কঠ আবেগের ঘার খুলে ওর ঠোঁটে এনে দিলে লুকিয়ে রাখা ব্যথা।

"কাঁগড়া চিত্রশৈলী অনুধাবন করতে আমি কিছু দিন হিমাচলের কাঁগড়ার একটি গ্রামে ছিলাম। পালমপুর চা বাগান সেখান থেকে বেশী দূর নয়। এই ছবিটা—'আড়াই পাতা' 'দেড় পাতা' আমি সেখানেই এঁকেছিলাম। আর এই যে মেয়েটি, এই দিকে দাঁড়িয়ে, ভালো করে দেখো, এ সেই মেয়ে, যাকে অন্য ছবিতে আমি নাম দিয়েছি "একটি মেয়ে : একটি ভরা সুরাপাত্র।"

"এ তো আমি আপনার বলার আগে চিনতেই পারিনি। তবে প্রথম দিনই এই ছবি দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেন অন্য মেয়েগুলি চায়ের একটি গাছে সাধারণ সব, আর এই মেয়েটি চা গাছের সবচেয়ে উপরের কিশলয়, ছোট, সবুজ ঝকঝকে।"

সুরেশ নন্দার প্রৌঢ় উদাস চোখে আবার এক অদ্ভুত তারুণ্যের আলো জ্বলে উঠল। উনি বললেন "আমি এবার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ভরপুর। তুমি নিজের অধিকারে এই সমস্ত কথা আমার অন্তঃস্থল থেকে টেনে বার করতে পেরেছ। এমন যথার্থ সক্ষম ব্যাখ্যা দিয়েছ আমার এই দুটি ছবির, তুমিই আমার জীবন কাহিনী শোনার উপযুক্ত লোক, তোমার অধিকার অর্জিত। আগে কখনো কারো মুখে আমি তোমার মত এমন কথা শুনিনি।

"এই মেয়েটিকে আমি টুনি বলে ডাকতাম। ওর নাম আমার কষ্টটুকুও করিনি। ওই আমাকে চা বাগানের নিত্যদিনের 'আড়াই পাতা' 'দেড় পাতা-র কথা বলেছিল। আমি বলেছিলাম, মনে আছে "তুই যেন মেয়েদের সেরা, চা গাছের শ্রেষ্ঠ কিশলয়—বড় দামী! কে জানে এই চা কার ভাগ্যে আছে—কে পান করবে এমন দুষ্প্রাপ্য চা।"

বৃষ্টির দিন ছিল, ভরা বর্ষা। একটা গভীর নালা এমন খানভাসী হল যে গ্রামের মধ্যে সংযোগ রাস্তাটাই গেল ডুবে। যাতায়াত বন্ধ। তিন দিন পর জল সরে রাস্তার হদিশ পাওয়া গেল। আমি এদিক থেকে যাচ্ছিলাম, ওই পার থেকে আসছিল টুনি। ওকে বললাম 'শেষ পর্যন্ত জল যাবলো কি বলো। একবার তো আমার মনে হচ্ছিল যে জল আর শুকোবেই না।

"জানো টুনি কী বললো? বলতে থাকে বাবু, এ কী মানুষের চোখের জল যা কখনো শুকোয় না?' আমি টুনির দিকে অবাক হয়ে দেখতেই থাকলাম। তারী সুন্দর মুখ ওর, কিন্তু ও যে এমন কথাও বলতে পারে, আমি ভাবতেও পারিনি। এরকই গভীর মর্মের কথা, কিন্তুটা, আমি অনেক দিন আগে এক বাংলা উপন্যাসে পড়েছিলাম, কিন্তু টুনি তো কখনও বাংলা উপন্যাস পড়েনি। কে জানে হয়ত পৃথিবীর সব দুঃখের একটাই ভাষা হয়।

ওর বাড়ি গেলাম আমি। ওর বাবা ছিল না, দুই ভাই ও এক বৌদি। ওর বাড়ির সমস্ত কথা আমি খুব খুঁটিয়ে আমার জেরা করে যেতাম। মেয়েটার মনে কী এমন দুঃখ থাকতে পারে যার জন্য ও এমন কথা বলেছিল? আর একদিন সেই দুঃখের বীজ আমি খুঁজেও পেলাম। অনেক ঋণের বোঝা ছিল ওর বাবার উপর। এখানে

মেয়েদের বিয়েতে প্রচুর দাম দেওয়া হয় ছেলেপক্ষকে—তিন চারশো থেকে হাজারখানেক পর্যন্ত। পনরোতা পনেরশো টাকার বিনিময়ে টুনিকে ওর বাবার থেকে কিনে নিয়েছিল। আর টুনি বলতো 'ও তো মানুষ নয়, রাক্ষস যেন। আমার তো স্বপ্নেও ওকে ভয় লাগে।"

এক দিন একান্তে আমি টুনিকে কাছে ডেকে বসিয়ে প্রশ্ন করলাম 'যদি আমি তোর এই ভয়ের বাঁধন খুলে তোকে মুক্তি দিই?

'কি করে বাবু?

'আমি পনেরশো টাকা দিয়ে দেবো তুই নিজের বাবাকে বল, এই নরক ভেঙে দিতে।

'অন্য কোন মেয়ে হলে কৃতজ্ঞতায় পায়ে পড়তো। কিন্তু টুনি সোজা আমার হৃদয় হরণ করে নিলো। বলে বললো 'বাবু, তুই আমাকে বিয়ে করবি?

আমি কখনো বলেছিলাম 'টুনি তুই চা গাছের সবচেয়ে দামী কিশলয় যেন। এমন দুর্লভ চা কার ভাগ্যে আছে রে? আর আজ মিথ্যের হৃদয়ের কচি কিশলয় থেকে আমার জন্যে এক অদ্ভুত অন্যত ডেকে এনেছে। তবে না তো এই কথা আমি ভেবেছিলাম না বলেছিলাম। আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম যে আমি সে অর্থে ওকে ছাড়িয়ে নেবার কথা বলিনি। তাতে মনে হলো ওর সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। বললো 'আরে বাবু, আমি কি ভিখারি? আমার জীবন কিন্তু লোভা-পাপড়ী, শুদ্ধ ছিল না। কত মেয়েই তো এল আর গেল। আমি জীবনের একটা ছোট, খুবই ছোট্ট রাস্তা তাদের সঙ্গে চলতে পারলাম, কোন সময় সুদূর রাস্তায় তাদের সঙ্গে আমি কোনোদিন যাইনি। আর এখন তো আমার এই বিশ্বাসও নেই যে আমি কারো সঙ্গেই জীবনের সমস্ত সফর কাটাতে পারবো।

আমার জীবনে বড় তাপ, বড় তাত তুই সহ্য করতে পারবি না রে, এই জীবনের পেয়ালায় চুমুক দিতে গেলে ঠোঁটই পুড়বে।" আর টুনি-কে তোলাতে ওর ঠোঁটে একটা আঙুল আলতো আদরে ছুঁইয়ে দিলাম।

"দুঁ দিয়ে-দিয়ে ঠিক পার করে নেব বাবু" এই যে কথা শুনলাম, আর চমকে আমি টুনির মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনে হলো এই যে টুনি, এইই টুনির সঙ্গে আমি সারাটা জীবন ঠিক কাটাতে পারবো। জীবনের সফরে একসঙ্গে চলা যাবে। নিজের দিক থেকে ওর নির্মল আমি জলপার মোহরের মত, আবার বাজিয়ে দেখলাম বললাম 'তুই জানিস না কত, কত মেয়ে আমার জীবনে এসেছে। প্রত্যেককে আমি এক মদে ভরা পানপাত্রের মত ব্যবহার করেছি, পাত্র শেষ হয়েছে, নতুন মদে ভরে নিয়েছি।

টুনি হেসে ফেলল। বলতে থাকে "কেন বাবু, তোর ভেঙা মেটে না?'

আমি কিছু বলার আগেই টুনি আবার বললো 'আচ্ছা, একটা কথা হে বাবু। যতদিন আমার হৃদয়ের পেয়ালা শেষ না হয়ে যায়, তুই ততদিন অন্য কোন পেয়ালায় চুমুক দিবি না।"

আমার মনে হলো যে আজ অবধি যত মদ খেয়েছি, সব দেহসর্বস্ব, শুধু দেহ ঘিরে। তার মধ্যে হৃদয়ের পেয়ালা কোনটাও ছিল না। হলে হয়ত সে পাত্রের মদ না কোনোদিন শেষ হত, না আমি অন্য পাত্র ঠোঁটে তুলতাম। হয়ত হৃদয়ের পাত্রে চুমুক কোনোদিনই শেষ হয় না।

আমি তো নিজের নির্মল বারবার যাচাই করে দেখেছি। টুনির নির্মল ছিল খাঁটি—ওর মা-বাবাও আমাদের কথা মেনে নিলো। তখন আমি টাকা সংগ্রহ করতে শহরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

হুসেন মন্ত্রা যখন নিজের কাহিনী বয়ান করেছিলেন, তখন প্রায় আটটা বাজে। এই সময় প্রদর্শনী খতম হয়ে যেতো, তাই ঘর থেকে শিল্প-রসিকেরা ফিরে যাচ্ছিল নতুন কোনো দর্শকের আসার কথাও নয়। গল্পের

ফের কাটল না। তবে এখান অবধি বলে শিল্পী নিজেই নীরবতা টেনে গল্পকে সেখানেই বন্ধ রাখলেন।

আমি শিল্পীকে দেখছিলাম, দেখছিলাম হঠাৎ স্তব্ধ হওয়া গল্পকে। নন্দা যেন সমাধিস্থ।

চাপরাসী ছেলের ঘরমা বন্ধ করার জন্যে বাইরে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললাম, আর অপেক্ষা করতে থাকলাম। যদি থেমে যাওয়া গল্প আবার গতিময় হয়।

শিল্পীর বন্ধ চোখ দিয়ে বোধহয় জলের ধারা নেমেছিল। সেই জলে কাহিনী আবার ভেসে চললো।

"আমি টাকা নিয়ে যখন ফিরলাম, দেখি আমার সুখের পাত্র ভাগ্য আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

আমি কেঁপে উঠলাম "ওর বাবা কী টুনির বিয়ে অন্য কোথায় দিয়ে দিয়েছিল"? "তার থেকেও ভয়ংকর কথা।" টুনি যাকে রাক্ষস বলতো, সেই বুড়ো নিজের বাগদান ভাঙার খবর শুনে নিয়েছিল আর ছল করে কাউকে দিয়ে টুনিকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল—

টুনির চিতার একটু তাপ বাকি ছিল, কিছু অংগার। সেই আগুন সাক্ষী রেখে চিতার চতুর্দিকে আমি ঘুরে বিবাহের আচার পূর্ণ করলাম। হয়ত তিরিশ—পঁয়তিরিশ বছর বয়সে নন্দা এই অদ্ভুত বিবাহ করেছিলেন। পরের সুদীর্ঘ ত্রিরিশ বছর উনি কিভাবে সেই সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন, তা ওর এই ষাট-বাষট্টি বয়সেও প্রকট, মুখ ফুটে আর জিজ্ঞেস করতে হয় না। আমার মনে হল, সম্পূর্ণ বিশ শতাব্দী ওকে প্রণাম করছে ভক্তিভরে।

আস্তে-আস্তে শিল্পী ঠোঁট ছুঁই একটু কাঁপলো "টুনি বলে গিয়েছিলো—একটা কথা যে বাবু। আমার জীবনের প্রেমপাত্র খালি না হওয়া পর্যন্ত তুই অন্য জীবনপাত্রে চুমুক দিবি না।" ওই সামনে ওই যে টুনি, ও সাক্ষী, আমি কোনোদিন অন্য পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়াই না। সামনে টুনির সেই ছবি। একটি মেয়ে, পাত্রে সুরা মৃত্যু শিল্পীর হাত থেকে সুরাপাত্র ছিনিয়ে নিল, কিন্তু ওর কল্পনার খেয়াটানে যে সে পূর্ণ, মৃত্যু সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে অক্ষম। আর শিল্পীর সমস্ত জীবন এই অমৃত পানে কেটে গেছে। পাত্রের সেই অমর সুরা শেষ হয়নি।

প্রায় একবছর হতে চলল আমি সুমেশ নন্দার মুখে এই অদ্ভুত কাহিনী নিজে কানে শুনেছিলাম, পরের সপ্তাহে নিজের হাতে সে কাহিনী লিখে ফেলি, কিন্তু উনি আমাকে তা ছাপাবার সম্মতি দেননি। সে সময় আমি ওর এক কল্পিত নাম দিয়েছিলাম উনি অনুরোধ করেছিলেন "যতদিন না আমার অন্তিম সময় আসে, আমার কোন অধিকার গড়ে উঠবে না। এই সুরা আমাকে আমার শেষ দিন অবধি পান করে নিতে দাও, তারপর গল্পটা ছাপিও। এখন নয়। আর তখন, আমার নামও নিশ্চই তোমাকে বদলে লিখতে হবে না।" আর এবার, গত সপ্তাহে আপনারা কাগজে পড়ে থাকবেন যে প্রখ্যাত শিল্পী সুমেশ নন্দা গত হয়েছেন। ওর অদ্ভুত শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে কাগজে বেশ কয়েক কলম লেখা ছিল, কোথাও-কোথাও, দু-একটা কাগজে। যে ঘরে শিল্পী অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেখানে ছিল ওর আঁকা একটি মাত্র ছবি "একটি মেয়ে : পানপাত্রে সুরা।"

রেবতী

ফকীরমোহন সেনাপতি

অনুবাদ : এষা দে

কটক জেলায় হরিহরপুর পরগনার মধ্যে একটি মফস্বল গ্রাম, নাম পাটপুর। গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখে একটি বাড়ি। আশেপাশে চারটি ঘর, বেড়া দিয়ে ঘেরা। চৌকিশাল, আঙিনা, তার মধ্যে কুয়ো, সামনে সদর দরজা, পিছনে খিড়কি দুয়ার। সদর দিয়ে প্রথমেই খোলা একখানা ঘর, বাইরের লোকজনের ওঠাবসা সেখানে, খাজনা দিতে এলে প্রজারা বসে। শ্যামবন্ধু মহান্তি জমিদারের তরফে গ্রামের গোমস্তা, মাস মাইনে দু টাকা, মাইনে ছাড়া প্রাপ্তি রসিদ খত দখিনা ইত্যাদি বাবদ দু পয়সা হাতে আসে। সব মিলে মাসে চার টাকার কম হবে না। সংসার একরকম চলে যায়। একরকম কি? বলতে গেলে ভাল চলে। এইটা হল না, সেইটা অবে নেই—এ ধরনের কথা অবে কারো মুখে শোনা যায় না। বাড়ির গা ঘেঁসে তালপালা ছড়িয়ে উঠেছে দুটো সজনে গাছ। ভিতরে গোয়ালে বাঁধা বছর বিয়োনো দুটি গাই। একটু দুধ, একটু ঘোল হাড়ির তলায় পড়েই থাকে। বুড়ি দুধের সঙ্গে শুকনো গোবর মিশিয়ে ঘেরে রাখে। কাঠ কেনার ঝামেলা নেই। জমিদার বিঘা দশেক জমি চষতে দিয়েছেন। ধান বাড়তিও হয় না, কমও পড়ে না। শ্যামবন্ধু বড় সাদাসিধে লোক, প্রজারা তাঁকে মানে, সুখে থাকে। বাবা বাছা বলে ঘরজার ঘরজার ঘুরে খাজনা আদায় করেন। কারো থেকে অন্যায়ভাবে এক পয়সা নেন না। প্রজারা খাজনা দিয়ে রসিদ চায় না। তা সত্ত্বেও তিনি চার আঙুল তালপাতায় একটা রসিদ লিখে চালে গুঁজে দিয়ে চলে যান। জমিদারের পেয়াদা আসলে তাঁরই অন্ন গায়ে ঢুকতে পারে না। শ্যামবন্ধুই তার হাত পা ধরে পান তামাক খেতে দু পয়সা কোমরে গুঁজে দিয়ে বিদায় করে দেন। পরিবারে খাওয়ার লোক চারজন, কর্তাগিন্নি নিজেরা দুই, বুড়ি মা ও দশ বছরের একটি মেয়ে, নাম রেবতী। শ্যামবন্ধু সন্ধ্যাবেলা দাওয়াতে বসে কৃপাসিন্ধু বন্দনা গান, আরো অনেক ভজন করেন। কখনো কখনো কোঠার ওপর আসনটি বিছিয়ে ভাগবত পড়েন, রেবতী পাশে বসে শোনে। মুখেমুখে অনেক ভজন তার কচি গলায় তারি যানায়। সন্ধ্যাবেলা বাপের কাছে বসে তার ভজন গাওয়ার সময় গাঁয়ের অনেকে শুনতে আসে। রেবতী বাবার কাছে একটি ভজন শিখেছিল যেটি গাইলে শ্যামবন্ধু বড় খুশি হ'ন। প্রতিদিন মেয়েকে গাইতে বলেন। রেবতী গায়—

কার কাছে করি এ নালিশ পেশ
তুমি না চাইলে নাথ পরিব হবে যে শেষ।
কর বা না কর এনে পদে সমর্পিলি প্রাণ
হৃদে আছে তব নাম ধরি
তোমা বিনা জিবনৎ শূন্য হে হরি
চেতন কর জীবন প্রেমামৃত দান করি।

দুবছর আগে স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টার মফাবল যাত্রা দিয়ে যাবার সময় পাটপুরে একটা রাত কাটিয়েছিলেন।

গ্রামের মাথা মাথা ক'জন লোক বলাকওয়ার ফলে ভেপুটিবাবু ওড়িশা বিভাগের ইন্সপেক্টারের কাছে রিপোর্ট করে একটা আপার প্রাইমারি স্কুল খুলিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষকের বেতন মাসে চার টাকা। এই চার টাকা সরকারের কাছ থেকে মেলে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি ছেলে মাসে এক আনা করে দেয়। শিক্ষকটি কটক নরম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ, নাম বাসুদেব। নামটি যেমন বাসুদেব মানুষটিও তেমনি বাসুদেব। ছেলেটির অন্তর বাহির দুই সুন্দর। গাঁয়ের মধ্যে চলাফেরার সময় কারো দিকে চোখ তুলে চায় না। বয়স আন্দাজ বুড়ি। সুন্দর চেহারা যেন কুঁদে গড়া। ছেলেবেলায় রোগে ধরেছিল, যার জন্য মা মাথার গয়না যোতলের মুখ চাপা দিয়েছিলেন। আজও সে দাগ আছে। তা আর, দাগটা তাকে মানায়। বাসুদেব ছোটবেলা থেকে বাপমাহারা। মামাবাড়িতে মানুষ। জাতে ভায়রা, শ্যামবন্ধুও ভায়রা। কখনো কখনো বৃহস্পতিবার পূর্ণিমাতে বাড়িতে পিঠেপুলি হলে শ্যামবন্ধু পাঠশালায় গিয়ে বলে আসেন—বাবা বাসু! সন্ধেবেলা একটু আমাদের বাড়ি এসো—তোমার মাসীমা ডেকেছেন। এইভাবে আসা যাওয়ার ফলে দুজনের মধ্যে স্নেহমমতা গড়ে উঠল। রেবতী বাসুকে দেখলে বলে, আহা মামরা ছেলে, কী খায় কে-ই বা তার খাওয়াদাওয়া দেখে। বাসু প্রতিদিন সন্ধেবেলা শ্যামবন্ধুর কাছে বেড়ঘড়ি সময় বসে। দূর থেকে বাসুকে দেখলে, 'বাসুদা এসেছে, বাসুদা এসেছে। বলে রেবতী বাবাকে চেঁচিয়ে ডাকে। প্রতিদিন তার বাবার কাছে বসে শেখা ভজনগুলো বাসুকে শোনায়। বাসুর কাছে সে গান নতুন লাগে। একদিন একথা সে কথায় মধ্যে শ্যামবন্ধু শুনলেন যে কটকে মেয়েদের একটি স্কুল আছে। সেখানে মেয়েরা লেখাপড়া করে, সেলাই শেখে। সেদিন থেকে শ্যামবন্ধুর ইচ্ছে রেবতীকে পড়ানো। মনের কথাটা বাসুকে বললেন। বাসুর কাছে শ্যামবন্ধু শিক্ষকুলা। সে বলল, 'আজ্ঞে আমিও এই কথাটা বলব বলব করছিলাম। দুজনের পরামর্শে রেবতীকে পড়াশুনা শেখানো স্থির হল। রেবতী কাছে বসে শুনছিল, দু-লাফে বাড়ির ভিতর গিয়ে মা আর ঠাকুমাকে খবর দিল। 'আমি পড়াশুনা করব। মা বলল 'আচ্ছা আচ্ছা পড়বি খন।' ঠাকুমা বলল। 'পড়াশুনা কী লো? মেয়েমানুষের আবার পড়াপড়ি কী? রাঁধাবাড়া, পিঠেপুলি করা শেখ, আলপনা দেওয়া শেখ, পড়াশুনা আবার কী?'

রাতে শ্যামবন্ধু দাওয়াতে আমকাঠের পিঁড়িতে বসে বসে ভাত খাচ্ছেন। রেবতীও সঙ্গে। বুড়ি সামনে থেকে 'এক হাতা ভাত আন। ডালের জল একটু ঢেলে দে তো, নুন লাগবে একটু, ইত্যাদি বৌ-কে আদেশ করছেন। কথায় কথায় বুড়ি বলে ফেললেন, 'হ্যাঁরে ভাই, রেবী নাকি পড়াশুনা করবে? পড়াশুনা কী রে? মেয়ে মানুষের আবার পড়াপড়ি কী? শ্যামবন্ধু বললেন, 'সে যাই হোক, বলেছি যখন পড়ুক। কলার পটনায়েকের ঘরে মেয়েরা তো ভাগবত পাঠ করে, বৈদেহীহীন বিলাস ছন্দে গায়। রেবতী চটেমটে ঠাকুমাকে গালি দিয়ে বলল. 'যা লো বুড়ি পাদি ঘোষাকার। তারপর বাবাকে ধরে পড়ল, 'বাবা, আমি লেখাপড়া শিখব।' শ্যামবন্ধু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শিখবি'. সে দিন কথা এখানেই শেষ।

একদিন বিকেলে বাসুদেব সীতানাথবাবুর 'প্রথম পাঠ' একখণ্ড এনে রেবতীকে দিল। সে বড় খুশি হয়ে বইটির আদ্যোপান্ত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে। প্রথম থেকে শেষ অধ্যায়। সেখানে হাতি ঘোড়া গরু ইত্যাদির ছবি দেখে সে ভারি খুশি। রাজরাজড়ারা হাতিঘোড়া বেঁধে খুশি। লোকে হাতিঘোড়া চড়ে খুশি, আমাদের রেবী খুশি শুধু ছবিতেই। বৌকে দিয়ে মা-কে সব ছবি দেখানো হ'ল, তারপর ঠাকুমাকে। ঠাকুমা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ যা যা। রেবী তাকে 'দূর হ' গালি দিয়ে ফিরে আসে।

আজ দিনটি ভাল, শ্রীপঞ্চমী, রেবতী সকাল থেকে স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে ঘরবার করছে। বাসুদা এলে আজ বই পড়া শুরু হবে। বুড়ির ওসব বিচারের অনুষ্ঠান নেই। বেলা দু ঘড়ির সময় বাসু এসে পড়িয়ে

রেফ ফরে অ ফরে আ দুই ই দীর্ঘ ই দুই উ দীর্ঘ ঊ ইত্যাদি। প্রতিদিন পড়া চলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাদু এসে পড়ায়। দু বছরের মধ্যে রেবতী অনেক পড়ে ফেলে। মধু বাড়ুয়ে-র 'ছন্দমালা' পড়ার সময় জিভে আটকায় না।

একদিন রাতে শ্যামবন্ধু বলে ভাত খাওয়ার সময় মা ছেলেতে কথাবার্তা চলছে। বোধ করি পূর্বেই কিছু কথা হয়ে থাকবে, আজ সেই আলোচনারই উপসংহার।

শ্যামবন্ধু—কী বল মা, ভাল হবে না?

বুড়ি—হ্যাঁ, ভালই হবে। ভাতের কথাটা বুঝেছিস?

শ্যামবন্ধু—আজ পর্যন্ত আমি আর কোন্ কথাটা খবর করছিলাম ভাবো? সৎকায়স্থ, গরীব হলে কী হবে, আভিজাত্য তার।

বুড়ি—ধনদৌলত পরে। আগে ভাতের কথা আসে। তা এ বাড়িতে থাকবে তো?

শ্যামবন্ধু—এ বাড়িতে না থেকে যাবে কোথায়? হাজার হলেও মামা-মামী বৈ তো আর কেউ নেই।

রেবতী কাছে বসে ভাত খাচ্ছিল, কথাবার্তার মর্ম সে কী বুঝল কে জানে। কিন্তু সেদিন থেকে তার ভাবভঙ্গি যেন অন্যরকম। বাবার সামনে বাদুদা পড়াতে বসলে কেমন লজ্জা করে। কারণে-অকারণে সর্বদা হাসি পায়। মাথা হেঁট করে ঠোঁট চেপে হাসি লুকোয়। আজকাল বাদু পড়াতে আসলে প্রায়ই সে নিঃশব্দে পড়ে যায়, কখনো বা শুধু ঁ ঁ করে। পড়া শেষ হলে মুখ বুজে হেসে হেসে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সদর দরজার পাট ধরে তার পথ চেয়ে থাকে। বাদু এলেই ভেতরে পালায়। পাঁচবার ডাকলে তবে বেরোয়। এখন রেবতী বাড়ির বাইরে বেরুলে বুড়ি রাগ করে।

দেখতে দেখতে পঞ্চমী থেকে পঞ্চমী দুবছর কেটে গেল। বিধাতার বিধান—দিন কারো সমানভাবে যায় না। ফাল্গুন মাস, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কোথা থেকে এল ওলাওঠা। সকালে গ্রামে শোনা গেল গোয়ালা শ্যামবন্ধু মহান্তির ওলাওঠা হয়েছে। মকস্বল গাঁয়ে ওলাওঠা দেখা মাত্র সবার দরজা-জানালা বন্ধ। সত্যি নাকি চুপড়ি কাঁধে ওলাইচণ্ডী বুড়ি বাইরে রাস্তায় থেকে মানুষ তুলে নেয় সকলের বিশ্বাস। কেউ দরজার ধারে কাছে আসে না। এদিকে স্ত্রীলোক দুটি কী বা করবে। মেয়েটা শুধু ডেকে ডেকে খবরাখবর দেয়। খবর শুনে বাদুদের উঠুল থেকে দৌড়ে আসে। ভয় নেই, ভয় নেই, নিজের শরীরের চিন্তা নেই, শ্যামবন্ধুর কাছে বসে পায়ে হাত বোলায়, কোঁটা কোঁটা জল মুখে দেয়। বেলা তিন প্রহর সময় শ্যামবন্ধু বাদুর মুখের দিকে চেয়ে গোঙাতে গোঙাতে বললেন 'বা-দু-হ-রে-এ-ল।' গলা ছেড়ে বাদু কাঁদে। ঘরে কান্নার রোল। রেবতী মাটিতে গড়ায়। গ্রামের লোক শুনে ভাবল, সেল বোধহয়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যাবেলা সব শেষ। ক এখন কী করা। বাদুদের তো কালকের ছেলে, আর আছে দুটি স্কুলবধূ। গ্রামের বোপা বন সেটি বুজদার লোক, তার আদু পঞ্চাশ-ষাট পেরিয়েছে। কাল বললে কাল, আজ বললে আজ, পরকালের দিকে পা বাড়িয়েই আছে। এ ক্ষেত্রে দুটো কাপড় পাবার আশা। কোমরে গামছাটা বেঁধে কাঁধে কুড়ুল ফেলে হাজির হয়ে গেল। গ্রামে কায়স্থ নেই এক ঘর। তাই শাঁতড়ি বৌ আর বাদুদের তিনজন ধরাধরি করে শেষ কাজটা সম্পন্ন করল। সে সময়ের কথা লিখতে হাত সরে না। শ্মশান থেকে ফিরতে ফিরতে শুকতারা ডুবে গেল। বাড়ি এসেই রেবতীর মা খিড়কিতে গেলেন। দেখতে না দেখতে দুপুর নাগাদ গ্রামে রটে গেল রেবতীর মা আর নেই।

দিন চলে যায়, সময় কারো জন্য বসে থাকে না। কারো পাতে মণ্ডা মিঠাই, কারো বা শুধু পান্তা। সকলেরই

দিন যায়, পক্ষের দিন যায়। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। শ্যামবন্ধুর বাড়িতে দুটি গরু ছিল। এরমধ্যে বাকি টাকার দায়ে জমিদারের লোক তাদের বেঁধে নিয়ে গেল। আমরা জানি জমিদারের প্রাপ্য টাকা শ্যামবন্ধু নিবের নির্মাল্য জ্ঞান করতেন। এক টাকা উসুল হলে জমিদারী কাছারিতে তা জমা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর ঘুম হ'ত না। অবশ্য তাঁর দেয় টাকা বাকি পাকে না না থাক গরু দুটি যে দুধালো সে কথা জমিদারের আগে থেকেই জানা। পর চাষ করার জন্য যে বিঘা দশেক জমি দেওয়া ছিল তাও জমিদার কেড়ে নিয়ে নিলেন। হালিয়াটা বসে বসে কী করবে। দেখতে পূর্ণিমার দিন চলে গেল। বলদ দুটো সাতে সতেরো টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। দুটো প্রাণ, ক্রিয়াকর্মের খরচ মিটিয়ে যা বেঁচে ছিল তাতে টেনেটুনে একমাস চলল। আজ কাঁসার এটা কাল পিতলের সেটা বাঁধা দিয়ে আরেক মাস কাটল। বাসু দুবেলা সদর দরজায় এসে খবর নেয়, রাতে এক ঘড়ি পর্যন্ত থাকে। ঠাকুমা নাতনী শুতে গেলে নিজের ধান্দায় যায়। বাসু কোনো টাকা পয়সা দিলে ঠাকুমা বা নাতনী কেউ নেয় না। জোরজার করে ধরিয়ে দিলে মেঝেতে পড়ে থাকে, বাসু জানতে পেরে আর কিছু দেয় না। বুড়ির কাছ থেকে এক দু পয়সা নিয়ে বাজার সওদা কিনে আনে, তাতেই আট-দশদিন চলে। বাড়ির চাল উড়ে গেছে, ছাওয়া দরকার। বাসু দু টাকার খড় কিনে বাইরে গাদা করেছে, অসুবিধা হেতু চাল ছাওয়া হয়ে ওঠেনি। বুড়ি এখন আর দিন-রাত বলে কাঁদে না। কেবল সন্ধে হলে কাঁদে। কেঁদে কেঁদে বাড়িতে সন্ধ্যা, সেইখানে রাত কাটে। রেবতী কোঁপোতে কোঁপোতে পাশে পড়ে থাকে। বুড়ি আর এখন চোখে ভাল দেখে না, পাগলের মতো হয়ে গেছে। ইদানিং কান্না জমিয়ে শুরু করেছে রেবতীকে গালাগালি। সে মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে এত দুঃখ এত দুর্দশার মূল কারণ রেবতী। রেবতীর পড়াশুনা শেষের ছেলে সরল, ছেলের বৌ মরল। হালিয়া তাদের ছেড়ে বলে গেলে, বলদ বিক্রি হল, জমিদার গরু জমি সব নিয়ে নিল। রেবতী অলক্ষুণে, অপয়া, লক্ষীছাড়ী। বুড়িয়ে চোখে দেখতে পায় না তারও কারণ রেবতীর লেখাপড়া। বুড়ির গালাগালি দেবার সময় রেবতীর চোখ থেকে দুটি ধারা ঝরে চলে, তবে বুড়ির কাছে ঘেঁসে না। হয় সদর দরজায়, নয় তো ঘরের কোণে মুখ ঢেকে কাঠের মতো বসে থাকে। বাসুও দোষী, কারণ সে না আনা অবধি রেবতী তো লেখাপড়া করেনি। সে-ই তো এসে পড়তে বসাল পড়তে শেখাল। তবে বুড়ি বাসুকে সামনা-সামনি কিছু বলতে পারে না, বাসু না হলে বাড়ি এক হতে অচল। কারণ জমিদারের পুঁতরাজ শেষ হয়নি। তার লোক এসে আজ এ হিসেব কাল সে হিসেব চায়। বাসু না হলে হিসেব পত্রের বিষে ফুলে কাপাস বের করে দেবে কে। তবে বাসুর অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে নিজের মনোভাব পরিষ্কার প্রকাশ করে। রেবতী আর সেই গৃহপ্রাঙ্গনে সঞ্চারিনী লীলাময়ী প্রতিমা নয়। তার গলা কেউ আর শুনতে পায় না। বাপটা চলে যাবার পর থেকে তাকে, আর কেউ সদর দরজার বাইরে দেখেনি। প্রথমে কতদিন বাবাগো মাগো ডাক ছেড়ে কেঁদেছিল, এখন আর চিৎকার করে কাঁদে না, শুধু দিবারাত্র তার বড়বড় চোখদুটো নীলপদ্মের মতো জলে টলটল করে। তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তাতে আরো ক্ষুদ্র মনটি একেবারে ভেঙে গেছে। বর্তমানে তার কাছে দিন-রাত সমান। তার চোখে সূর্যের আলো নেই, রাতে অন্ধকার হয় না, সমস্ত জগৎ শূন্য। তবুও পূর্ণ করে আছে পিতা-মাতার মূর্তি। মা এখানে ব'সে, বাবা চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তার চোখে খালি এ দুটি দৃশ্য। সে বিশ্বাস করতে পারে না যে বাবা-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁরা আর ফিরে আসবেন না। পেটে খিদে নেই, চোখে নেই ঘুম, দিবানিশি পিতামাতার ধ্যান। ঘেন্নায় বলে শুধু ঠাকুমার জন্যে। মেঝে থেকে প্রায় ওঠেই না। হাড় চামড়া সার দেহে প্রাণটা শুধু ধুকধুক করে। কেবল বাসুদেব এলে যে মাটি থেকে উঠে বসে, বড় বড় চলচল চোখে বাসুর দিকে তাকায়। চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে কেবল বাবা কিছু করে। বাসু যতক্ষণ থাকে, রেবতী তার দিকে চেয়ে চেয়ে বসে থাকে। তখন আর কিছু জ্ঞান

নেই, চোখে বাসুদেব, চিন্তায় বাসুদেব, সমস্ত হৃদয়টা বাসুদেবময়।

ভাবনা যারা যাবার আজ হাতে গোনা পাঁচ মাস। এখন চৈত্র, একদিন ঠিক দুপুরবেলা বাসু দরজায় টোকা দিল। এই সময় সে কখনো আসে না। বুড়ি হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে দরজা খুলল। বাসু বলে, ঠাকুমা (বুড়িকে সে বরাবর 'ঠাকুমা' ডাকে), ডেপুটি ইন্সপেক্টর হরিপুর থানাতে বসে পাঠশালার ছেলেদের পড়া জিজ্ঞেস করবেন, ইস্কুলের সব ছেলেরা যাব। আমার কাছে চিঠি এসেছে, আমি ছেলেদের নিয়ে কাল সকালে চলে যাব, পাঁচদিন লাগবে। রেবতী দরজার কোণে দাঁড়িয়ে শুনছিল, ধপাস করে বসে পড়ল, ভাগ্যে কপাটটা ধরেছিল, নইলে সোজা পড়েই যেত। বাসু পাঁচদিনের জন্য চাল ডাল তেল নুন কিনে এনে আঙিনায় রেখে গেল। তারপর বুড়িকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে শনিবার সন্ধ্যের মুখে। যাবার আগে বুড়ি বলে, সাবা, রোধে যেন বেশি ঘোরাঘুরি কর না, শরীরের দিকে নজর দিও। দুপুরে দুটো নিশ্চয় মুখে দেবে। কথা শেষ করে নিঃশ্বাস ফেলেন। রেবতী বাসুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। বাসুর চাউনিও আজ অন্য দিনের মতো নয়। আগে রেবতীকে ভাল করে দেখার প্রবল ইচ্ছে হলেও সে তাকাতে পারত না। আজ চার চোখের মিলন হল। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কারো আয়ত্তে নেই। বাসু চলে গেল। বেলা আর নেই। রেবতী যেমন স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল তেমনি চেয়ে থাকে। বুড়ির ডাকে যখন তার চেতনা ফেরে, ঘরে বাইরে সব অন্ধকার।

রেবতী বলে দিন গোনে, আজ ছদিন। বাপমা চলে যাবার পর সে মহলমুখো হত না। আজ সকালে দুবার বাইরে মুখ বেরিয়ে গেল। বেলা আন্দাজ দু ঘড়ি, ইস্কুলের ছেলেরা ফিরে আসা মাত্র লোকে বলাবলি করতে শুরু করে হরিপুর থেকে ফেরার সময় পথে গোপালপুরে বট গাছের তলায় পণ্ডিতকে ওলাওঠায় ধরল, চারবার ভেদবমি, মাঝরাতে শেষ। গ্রামের ছেলে বুড়ো মা মাসি সব হায় হায় করতে থাকে। কেউ বলে, 'আহা কী রূপ ছিল'। কেউ বলে 'কী ধীর স্থির'। কেউ বলে, 'বাইরে রাস্তা দিয়ে চলার সময় মাছিটিকে পর্যন্ত মারত না।'

রেবতী শুনল, বুড়ি শুনল। কেঁদে কেঁদে বুড়ির কণ্ঠরোধ, আর কাঁদার শক্তি নেই। শেষে বলে, 'আহা বাবারে, বিদেশ বিভূঁইয়ে নিজের বুদ্ধির দোষে প্রাণটা হারালো রে।' অর্থাৎ সে রেবতীকে লেখাপড়া শেখানোর দুর্বুদ্ধি করেছিল বলে মরে গেল, নইলে কখনো মরত না।

রেবতী খবর শোনার পর থেকে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দিনটা গেল। তারপর দিনগুলি রেবতীকে আশেপাশে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, 'রেবতী লো, ও লো রেবী, পোড়ামুখী হাড়জ্বালানী!' বুড়ি এখন পাগলিনী, কাঁদাকাটা করে না, খালি রাগে রেবতীকে গালি দেয়। পাড়াপড়শী রাস্তার লোক যখন যায় তখনই শোনে, 'রেবতী লো, ওলো রেবী পোড়ামুখী হাড়জ্বালানী!' বুড়ি তো আর চোখে দেখে না, হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে রেবতীকে পায়। তাকে জবাব না পেয়ে তার দেহে হাত বুলিয়ে দেখে গায়ে জ্বর। শরীর থেকে আগুন বেরুচ্ছে, জ্ঞান নেই। বুড়ি বহুক্ষণ বসে ভাবে। কী করবে তাকে ভাববে, মনের মধ্যে জলসংসার খোঁজে। কাউকে কাছে পায় না। কিছু স্থির করতে না পেরে খাপ্পা হয়ে বলে ওঠে, যেমন কর্ম তেমন ফল। অর্থাৎ তুই লেখাপড়া শিখতে গেলি বলে জ্বর হ'ল, তা আমি কী করব।

একদিন যায়, দু দিন যায়। তিন দিন চার দিন পাঁচদিনও চলে গেল। রেবতী খাটের সঙ্গে মিশে গেছে। চোখ খোলে না। তাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। উঁ আঁ শব্দও নেই। আজ ছ'দিনের দিন রেবতী সকাল থেকে দু-চার বার চেঁচাল। বুড়ি কাছে যায়। শরীরে হাত বুলিয়ে দেখে হাত পা ঠাণ্ডা। তাকলে উঁ আঁ জবাব দিচ্ছে। কটমট করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কিছু না জিজ্ঞাসা করলেও কত কথা বলে চলেছে। কোনো কবিরাজ

P31121

দেখলে 'কৃষ্ণা হাহুংপ্রলাপশ্চ' ইত্যাদি শ্লোক আউড়ে বলতেন, 'সান্নিপাতিক লক্ষণম্।' বুড়ি কিন্তু একটু খুশিই হ'ল, দাক দেহটা সরম নয়। আগে কথা বলছিল না। এখন বলছে, আগে চোখ মেলে ছিল না এখন মেলছে। জল খেতে চাইছে। দু-দিন হল মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। এবার একটু পথ্যি পড়লে মেয়েটা উঠে বসবে।

'তুই শুয়ে থাক, আমি চাট্টি পথ্যি রেঁধে আনি', বলে বুড়ি বাইরে বেরলো। পথ্যি রাঁধবেটা কী? ঘরে চুপড়িডালাহাড়িমলা সব খুঁজল, এক মুঠো চালও নেই। নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ে। বাপু পাঁচদিনের চালডাল কিনে দিয়ে গিয়েছিল, তাতে দশদিন কী করে চলে গেছে বুড়ির বুদ্ধিশক্তি থাকলে বুঝত। তবে বসে বসে চিন্তা ভাবনা করলে বুদ্ধি আসে। অর্থ যাসনসম্বল কিছু নেই। হাতে একটা ছুটো ঘটি ঠেকল। সেইটা নিয়ে চলে হরি শা-র দোকানের দিকে। হরি শা-র বাড়ি গ্রামের মধ্যেখানে, তার বাসনমেরামতির দোকান নেই। আছে মুদিখানা, চালডাল তেলনুন রাখে। ভিনদেশী কেউ এসে পড়লে কেনাকাটা করে। গ্রামের লোক দরকার হলে এখানে সওদার জন্য আসে। হরি শা তো বুড়ির হাতে ঘটিটি দেখেই উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। বুড়ির অভিপ্রায় জেনে হরি ঘটিটা হাতে নিয়ে চারিদিক তাকিয়ে বলে 'না, মা আমার কাছে চাল নেই, আর এই ছুটো ঘটি রেখে চাল দেবেটা কে?' হরির কাছে যে চাল নেই তা নয়। দেবার ইচ্ছেও আছে, শুধু বাসনটা বন্ধক রেখার মতলব। চাল নেই শুনে তো বুড়ির মাথায় বাজ। কী করবে, মেয়েটা জ্বর থেকে উঠেছে, কী মুখে দেবে তার? এক ঘড়ি সময় বলে থাকে, বেলা পড়ে যায়। হরির দিকে বার দুয়েক চায়। না, গিয়ে দেখি মেয়েটা, কী করছে। ঘটিটা নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় হরি বলে, 'যাও, ঘটিটা দিয়েই যাও। দেখি ঘরে কী আছে। হরি ঘটিটা রেখে চার মান চাল, আধ মান খুদ, একটু নুন এনে দিল। চার-ক' জানলা বলে দাঁড়িয়ে বুড়ি বাড়ি দেখে। এ পর্যন্ত দাঁতে দাঁতন ঠেকায়নি, শরীর মনের কথা কী বলব। বাড়ি পৌঁছে রেবতী'কে ডাকে। তার বিশ্বাস রেবতী ভাল হয়ে গেছে, জল তুলে দেবে, সে রাঁধবে। রেবতী জবাব না দেওয়ায় ভাবি খারা হয়ে হাঁক পাড়ে, 'ও লো রেবতী লো পোড়ামুখী হাড়জ্বালানী!' কোনো জবাব নেই।

এদিকে রেবতীর সান্নিপাত রোগ ক্রমে বাড়ছে, ভয়ানক যন্ত্রণা, শরীর ধীরে ধীরে শীতল, গলা শুকনো, প্রচণ্ড পিপাসা, জিভটা যেন গলার ভেতরে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে হয় চাঁচাতে যায়। কোনক্রমে উঠে ঘর পেরিয়ে বাইরে আসে। ভাল লাগে না। পিছনের দরজা দিয়ে দাওয়ায় আসে। বেলা পড়ে আসছে। খুব হাওয়া বইছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে। চেয়ে চেয়ে দেখে পিছনের বাগিচাটুকু। এই কলাগাছটা বাবা সতেরছর লাগিয়েছিলেন, মোচা হয়েছে। দু-বছর আগে মা ঐ পেয়ারা গাছটা পুঁতেছিলেন। রেবতী ছুটে ছুটে ঘুরো থেকে জল তুলে গাছটার গোড়ায় ঢালত। এখন সে গাছ কত বড় হয়েছে, ফুল ধরেছে। গাছ দেখে মা-কে মনে পড়ে। বুদ্ধি স্থির নেই, মন চঞ্চল, সঙ্গতি রেখে কিছু মনে করতে পারে না। শুধু মায়ের আনন্দময়ী মূর্তি মনকে ছাড়ে না। গাছের মূল থেকে তালপালার আড়ালে সব জায়গায় অন্ধকার নেমে আসে। আর কিছু দেখা যায় না, আকাশের দিকে চায়। সন্ধ্যাতারাটি ত্রিকৌণিক কিরণ দিচ্ছে। একমনে রেবতী সেই তারাটির প্রতি চেয়ে থাকে, চোখে পলক নেই। তারার আকার ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে, চক্রের মত আকৃতি হয়ে গেল, আরো বড় আরো উজ্জ্বল। এ কী মূর্তি তার ভিতর? শান্তিবাহিনী প্রেমময়ী আনন্দময়ী মাতার অভয়মূর্তি। সস্নেহে কোলে নেবার জন্য ডাকছেন। দুটি কিরণময় হাত মা বাড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণরেখা এসে তার চোখদুটি স্পর্শ করে হৃদয়ে প্রবেশ করল। অন্ধকারের মধ্যে আর কোনো শব্দ নেই। কেবল নিঃশ্বাসের আওয়াজ। সে শব্দ ক্রমে প্রবল দীর্ঘশ্বাস, শেষে 'মা মা' ধ্বনায় অস্পষ্ট শোনা গেল। বাসবাসিচা নিস্তব্ধ নীরব।

এদিকে বুড়ি ঘরটে ঘরটে রেবতীর শোওয়ার জায়গাটায় গিয়ে দেখে কেউ নেই। সব ঘর, বাইরে আঙিনা,

কেঁকিশাল কোথাও নেই। মনে ভাবে ভাল হয়ে গেছে। দেওঘরে বাগিচায় বেড়াচ্ছে। অতঃপর সেই ডাক, 'ও লো রেবতী, রেবী লো, ও লো পোড়ামুখী হাড়জ্বালানী লো!'

খিড়কি দরজায় আসে। হাতড়ে হাতড়ে দাওয়ায় ওঠে, মেঝে থেকে দুহাত উঁচু। একহাত চওড়া দাওয়া। 'মরণ, তুই ঐখানে বসে আছিস। মেঝে হাত দিতে বুঝি প্রথমে চমকে যায়। আর একবার ভাল করে পা মেলে মাথা পর্যন্ত ঘোলায়। নাকে হাত দিয়ে একটা বিকট চীৎকার ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ার তলায় ঝড়াম করে শব্দ।

ভামবন্ধু মহান্তির বাড়ির কোনো প্রাণী জগতে আর কেউ নেই। পড়শীরা রাত প্রায় এক প্রহর সময় শেষ আওয়াজ শুনে ছিল—'ও লো রেবতী, রেবীলো, ওলো পোড়ামুখী, হাড়জ্বালানী লো।'

লেখক পরিচিতি : আধুনিক ওড়িশার ইতিহাসে ফকীরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮) এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। পেশায় প্রথমে শিক্ষক ও পরে দেশীয় রাজ্য প্রশাসক। সমকালীন বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম ধর্ম। ব্রতী হন জনমুখী কার্যক্রমে। সারা জীবন প্রচুর লিখেছেন, অল্প বা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে সমবায়ের ওপর পুস্তিকা। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের **জীবন চরিত** ওড়িয়াতে অনুবাদ করে তাঁর লেখক জীবন শুরু। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বেশ ক'টি প্রসঙ্গী গ্রন্থের তিনি ওড়িয়া পদ্যানুবাদ করেন। মৌলিক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন ছটি। ফকীরমোহনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি আধুনিক ওড়িয়া গদ্যের জনক, ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম গল্পকার ও সার্থক উপন্যাসিক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস চারটি—**ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ** (১৮৯৭-৯৮) **লছমা** (১৯০১) **মামু** (১৯১৩) ও **প্রায়শ্চিত্ত** (১৯১৫), একটি গল্প সঙ্কলন। **গল্পস্বল্প** (১৯১৭) এবং আত্মকথা **আত্মজীবন-চরিত** (১৯১৭)। প্রাক-আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের আদিরসাত্মক কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর পরম্পরা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তিনি যাঁকেন সমকালের প্রেক্ষাপটে সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখ লোভ-হিংসা আশা-নিরাশার বাস্তবানুগ চিত্র। তাঁর সহজ-সরল কথ্যভাষা নির্ভর ভাষশৈলী প্রাচীন অলঙ্কারবহুল সংস্কৃত কেন্দ্রিক ঐতিহ্য থেকে ওড়িয়া সাহিত্যকে মুক্ত ক'রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

'রেবতী' গল্পটিতে জনজীবনে তাঁর প্রামাণ্য অভিজ্ঞতার পরিচয় ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির সমাহারে ফুটে উঠেছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজে আধুনিকতার অভিঘাতে সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি মানুষের করুণ আলেখ্য। প্রথম প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯১৮ 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায়। অনেক ওড়িয়া সাহিত্য সমালোচকদের মতে 'রেবতী' ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্প।

ঘড়ি

উইকতোর উরোভাইলেস্কি

ভাষান্তর : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

[গল্পটি বেরিয়েছে মারিয়া ফুনদেউইচ্-এর (উচ্চারণ আমার) ও পোলিশ ভাইও নামের লন্ডনের। ছবি, কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পে আধুনিক পোলিশ মননের পরিচয় দিতেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। উরোভাইলেস্কির বয়স এখন ৭১ (জন্ম ১৯২৭)। ওলট-পালটের আগে পর্যন্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। উচ্চশিক্ষা মস্কোয়। মূলত কবি। বেঁচে আছেন। থাকেন ওয়ারশ-য়। এই অনুবাদক যে-কটি ভাল গল্প পড়েছে 'ঘড়ি' তার মধ্যে একটি। সত্যিই কবির লেখা।]

রোমানকে আমার বাবা-মা সত্যিসত্যিই অপছন্দ করতেন বলে আমার মনে হয় না। এও নয় যে, আমাদের বিয়ের ভবিষ্যৎ ব্যাপারে ওঁদের কোনোকিছুও আশা ছিল না। বরং উল্টো। শিক্ষিত আর বুদ্ধিমান জামাই বলে ওঁদের আসলে বেশ কিছুটা গর্বই ছিল। ছেলের বংশ-পরিচিতিও খুব একটা কেলনা নয় তো। জামাই-বাবাজীবনের সঙ্গে শ্বশুরমশাই তো কত-না বিষয়েই কথা বলতেন। ব'লে আনন্দ পেতেন বলেই না! বিশেষ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

তবে, ওর শুধু একটাই দিক ছিল যা আমার বাবা-মা পুরোপুরি অপছন্দ করতেন। এবং শেষমেশ, তাঁরা রোমানকে ক্ষমা করতে পারেননি কোনও দিনই। আর মনে হত, রোমানকে বুঝি তাঁরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারছেন না। আর সেটা হল : নানারকম সৌখিন জিনিসপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের সমস্ত আগ্রহ নিয়ে রোমান কোনওদিনই উৎসাহ দেখায়নি।

অথচ, এই যে এক-একটা জিনিস সংগ্রহ দিয়ে অধিকারবোধ এবং তার সঙ্গে অনিমেষ সম্পর্ক—এটা এটা ছিল আমাদের পরিবারের একটা মৌলিক চরিত্র। এইসব এক-একটা তুলভ জিনিস এরাই ছিল আমাদের পরিবারের পরম্পরা আর প্রতিষ্ঠার প্রতীক। আমাদের সমস্ত খুশি আর উচ্চাশার এরা ছিল এক-একটা আধার। আমাদের তিনজনের সুখী পরিবার, পরিবারের যাবতীয় প্রয়াস ও সাফল্যের এরা যেন ছিল এক-একটা ঝুলো-ভাড়া ট্রফি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সব সংগ্রহ যা মানুষ খুঁজে খুঁজে ঘরে এনে তোলে, তার মূল্য তো কম নয়। একজন মানুষের সংগ্রহের গুণগত মাহাত্ম্যের দিকটা বুঝেই না আমরা মানুষটির চরিত্র বিচার করি।

হোক না সে এক্ষুনি আসবাব, তার যদি কোনও ইউনিক নেম থাকে, সে তো আমাতেই বর্তাবে। সাদাত কাপ-ডিস একজোড়া আর তাতে পরিবেশিত দার্জিলিং চায়ের সুরভি—সেও তো, সেটাও তো আমি। তাছাড়া, কার বাড়ির জিনিসপত্র কেমন, এর একটা বিশ্বাসযোগ্যতার দিকও আছে। নেই কী? ধরুন, কারো বাড়ি গেলেন। ছোঁড়া মানুষ পেতে বসতে দিল। খুব একটা বিশ্বাস করবেন কি তাকে?

অন্যথায়, আমাদের জীবনযাত্রা ছিল একেবারেই সাদাসাটা। আমার বাবার কোনো মহার্ঘ চরিত্রদোষ ছিল না। যেমন, মদ্যপান ; না। ধূমপান ; না। মেয়েমানুষ ঘটা ; না-না।

অতএব, মাসের প্রতিটি মাইনের দিনেই আমাদের বাড়িতে দেখা দিত একটা না-একটা নিত্যনতুন জিনিস ;

চিনি রাখার রুপোর বাটি। সুন্দর গ্রিল-দেওয়া পিলো কাভার, কী একখানা একটা, আ, আশ্চর্য টেবিল-ন্যাপ্‌কিন। ঐ যে আদ্যিকালে গ্রামোফোনটা আমাদের বসার ঘরে, ওটা বাবা কিনে এনে ছিলেন এক সেল থেকে—সঙ্গে খানকয়েক পুরনো রেকর্ড। ওটা সম্পর্কে কী সর্বই না ছিল আমাদের! যখন চলত।

না-না-না। তা বলে রোমান কখনো বিদ্রূপ করেনি বাবার এইসব কিউরিও বাতিকগুলো। 'বুর্জোয়া' কখনোই বলেনি, ছি। মানুষের এইসব প্রবণতাকে সে স্বাভাবিক বলেই মনে করত এবং বুঝতেও পারত। তবে সে এ নিয়ে যা মোটার, বড় চট করে বুঝে ফেলত এবং তারপর ওদের সম্পর্কে হয়ে যেত সম্পূর্ণ উদাসীন। সে পয়সা খরচ করত ভুলে। হাতে ফুল নেই অথচ রোমান এল, এমনটা মনেই পড়ে না। থিয়েটারের দামি টিকিট কিনে আনত আমাদের সকলের জন্যে এবং প্রায়ই। আমার বাবা যখন হিসেব করে দেখাতেন যে ঐ পয়সায় কী কী জিনিস কেনা যেত যা দুদিনে শুকিয়ে যায় না, বা, প্রবেশ-পথে ছিঁড়ে ফেলা হয় না এবং মা তা সমর্থন করতেন—সে শুধু ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকাত।

যাইহোক; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মান আগ্রাসন যখন রোমানের ডাক পড়ল, বাবার দিন বাবা ওর সংগ্রহ থেকে একটা সুন্দর তহপরি বিদেশী ঘড়ি উপহার দিলেন ওকে। রাতে ট্রেঞ্চের মধ্যেও সময় দেখতে পাবে—কারণ, তারাল জ্বলে উঠবে অন্ধকারে। রোমান ধন্যবাদ জানাল বিনীতভাবে এবং ঘড়িটা ওর ইউনিফর্মের পকেটে রেখে দিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর দারা সন্ধেবেলা এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য নেই। আমাদের বাড়ি থেকেই স্রেফ চলে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরে ডিনারে বসে বাবাই প্রথম মুখ খুললেন, 'দেখো তোমরা, ঘড়িটা ও ঠিক ট্রেঞ্চের মধ্যে হারিয়ে আসবে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বাবার আরও মন্তব্য, 'তোমার এই বরটি বাপু একটু হাবলা-টাইপের। আমার ঐ চিনে ভুলদানিটা বাজি রেখে বলতে পারি, কেউ না-কেউ ঘড়িটা এর মধ্যেই সরিয়েছে এবং ও তা টেরই পায়নি এখনও।'

এরপরেও ঘড়ি-প্রসঙ্গ উঠেছে এবং যখন-তখন। স্রেফ, সত্যি বলতে কি, ঘড়ির তেমন কোনো প্রয়োজনই হয় না। জানলায় আছে এখন সৈন্যরা ঘড়িফড়ি ও-সব বাড়িতে রেখে যায়। পৃথিবীতে ঘড়ির অভাব নেই। কিন্তু এক-একটা ঘড়ি আছে যা হারানো যায় না, বাবা বলতেন—হারালে, তার অভাব পূর্ণ হবার নয়। মানুষের এ-সব জানা উচিত। বোঝা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, রোমান চিঠি লেখে কিন্তু তাতে ঘড়ির কথা একবর্ণও থাকে না—এটা কি একটা ভেবে দেখবার মত ব্যাপার নয়? ঘড়িটা আদৌ ঠিকঠাক চলছে কিনা, কোনো মেরামতির দরকার আছে না নেই, কিম্বা ঘড়িটা আদপে ওর কাছে আছে কিনা—কিছুই জানার উপায় নেই।

বছর ঘোরার মুখে ছুটিতে রোমান বাড়ি এল। একথা-সেকথার পর ঘড়ির কথা উঠতেই সে ইউনিফর্মের পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল। প্রতি পাঁচ-মিনিটের মাথায় হীরে, কথাগুলো বলছে আর সেকেণ্ডের কাঁটাও ঘুরে যাচ্ছে ঠিক ঠিক। 'কী জানো বাবা,' বাবা বললেন, 'আমরা সবাই সাবালক। যুদ্ধ কী জিনিস, আমরা সবাই বুঝি, ভগবান না করুন, যদি তোমার ভালমন্দ কিছু হয়…'

'বাপ্‌-পি!' আমি চিৎকার করে উঠি।

'না-না। বাবা তো ঠিকই বলছেন।' রোমান অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমি এবার ঘড়িটা রেখেই যাব।'

'দেখলি তো।' বাবার চোখ চকচকিয়ে ওঠে, 'তোমার তোর চেয়ে কত প্র্যাকটিকাল।'

তোমার ছুটে ফিরে গেল। ঠিক একমাস পরে আমাদের জানানো হল সাইবেরিয়ার রণক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়েছে।

সেই থেকে বাবা-মা-র সঙ্গে আমি আর কথা বলিনি। আমি বাড়ির বাইরে বেরুই না। কারণ, আমি যাবটা কোথায়? আর, কার কাছে? আমি একা-একা খেতে বসি। আর ওদের ঐ-সব আদরের জিনিসপত্র—কাঠি দিয়ে ছুঁতেও আমার ঘেন্না হয়। কেন জানি না, আজকাল আমার খুব বমি পায়। আর আমি বমি করি।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন রাতে রাতেই। এবং তখন মধ্যরাত হলেও, হয়ত বরফই পড়ছে—বাবা বাড়ির বাইরে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন প্রায়ই।

এই সময় থেকেই আমার বাবা মদ্যপান শুরু করলেন। তাঁকে ঘিরে এত দ্রুত ঘনিয়ে এল তাঁর সর্বনাশ, যা অবিশ্বাস্য। প্রিয় জিনিসগুলি একে একে অদৃশ্য হতে থাকল বাড়ি থেকে।

তবু, বহুদিন পর্যন্ত বাবা কিন্তু ঘড়িটা বিক্রি করেননি। সিলো কাতার, রুপোর চিনিদান, চিনে ফুলদানি যায় সেই অ্যান্টিক কোনোএকে—একে একে সবই বিক্রি হয়ে গেল। সব—সব বিক্রি ক'রে—সর্বস্বান্ত হয়ে—তবে ঘড়িটা।

অধিবেশন

আইজ্যাক ব্যাশেভিস সিঙ্গার
অনুবাদ : অতুল কুমার দত্ত

[আইজ্যাক ব্যাশেভিস সিঙ্গার ইংরেজী ও ইদ্দিশভাষার এবং বর্তমানে আমেরিকাবাসী লেখক। হিব্রু ভাষার সঙ্গে ইউরোপের মধ্য রাইন অঞ্চলে এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে কথিত ভাষাগুলির মিলনে ইদ্দিশ ভাষার উৎপত্তি। এই ভাষা-ভাষীগণ মুখ্যতঃ ইহুদী। তাদের হিটলার স্ট্যালিনের আমলে কি দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল—লেখকা কারো অবিদিত নয়। ইদ্দিশ ও ইংরেজিতে সিঙ্গারের সাহিত্য প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। তাঁর অনেক ইদ্দিশ রচনার তিনি নিজেই অনুবাদক। বর্তমান গল্পটির ইংরেজী অনুবাদক : ও লিস্টার গোরোপ।]

তাঁরা সকলেই ওয়ারশতে এসেছিলেন একটি সাংস্কৃতিক অধিবেশনের জন্য। আসলে তা, বিভিন্ন রাজপথী দলের যুক্তফ্রন্ট তৈরির জন্য তাড়াটে কর্মীদের একটা প্রচেষ্টা। পার্টির সদস্য, মৌলবাদী, উদ্বেগবাদী, শিক্ষক এবং যাঁরা সবসময়ই অধিবেশনে যোগ দেন অর্থাৎ স্থায়ী প্রতিনিধিরা তাঁরা সবাই এই অধিবেশনে এসেছিলেন। এটা ঘটেছিল মার্চ ১৯৩৮-এ। উদ্যোক্তারা পোলিশ রাজনৈতিক পুলিশ ডিফেন্সাইওয়াকে ফাঁকি দিতে সবরকম উপায় অবলম্বন করলেও পুলিশ অধিবেশন সম্বন্ধে সব কিছুই জানত।

দলীয় প্রতিনিধিরা মতবাদ সংক্রান্ত বাঁধা-ধরা বুলিতে ভর্তি দীর্ঘ বক্তৃতা নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ঘোটা পিং-বাঁধানো পুরু লেন্সের চশমা পরে ঘুর্তভাবে হাসছিলেন এবং নিজেদের বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে তাঁদের খুশি মনে হচ্ছিল। ইদ্দিশ সংস্কৃতির নামে তাঁরা পাণ্ডি-বুর্জোয়া এবং নিরক্ষর বুদ্ধিজীবী সমাজের সামাবাদে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছিলেন। প্রত্যেক কম্যুনিস্টই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে যতো তাঁর রূপের সমাদর করবে; প্রত্যেকেই ভাবতেন যে বিপ্লবের পরদিনই তাঁকে পোল্যাণ্ডের সর্বহারা সরকারে একটা উঁচু পদে বসানো হবে। সবরকম আপোষ ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করার দলীয় নির্দেশ নিয়ে তাঁরা অধিবেশনে এসেছিলেন। তিনদিন ধরে চলবার পর একটা বেশ বড় রকম ভোজ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি হবার কথা। হোটেলের রান্নাঘর সব রকম খাবার-দাবার দিয়ে ভরা ছিল—মাছ, মাংস, নানারকম সুপ, সুস্বাদু পেষ্ট্রি, এবং এই উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ খাবার। ব্যবস্থাপকরা জানতেন, যে এই বুদ্ধিজীবীরা যত ধরপাকড়ই করুন না কেন, ভোজের টেবিলে তাঁরা মিলে-মিশে যাবেন।

বিয়াল্লিশজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন মাত্র মহিলা, তাঁদের মধ্যে একজন কমরেড রোজা, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক। সে লুবলিনের একজন প্রতিনিধি, আংশিক অভিনেত্রী, কবিতা-আবৃত্তিকারী ও পল্লীসঙ্গীত গায়িকা। রোজা ছোট-খাট, সুলাঙ্গী ও পেচকাক্ষী। সে আধুনিক ইদ্দিশে কথা বলার চেষ্টা করত, জোরে জোরে হাসত, নামগুলি উল্টে-পাল্টে ফেলত, সামান্য কয়েকটা বাক্যাংশ সে জানত আর তাই সে প্রতিটি সুযোগে ব্যবহার করত। সেগুলির মধ্যে একটা ছিল : "আমরা যেন আমাদের প্রগতির শক্তিগুলিকে বিক্ষিপ্ত না করি।"

প্রায় সব পুরুষ প্রতিনিধিরাই কমরেড রোজার দিকে ঝুঁকি খেয়ে পড়লেন। গলার শুকতার জন্য তাকে তাঁরা সিগারেট ও লজেন্স দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তাঁরা সবাই তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সবাই তাকে গোপন কথাগুলি বলতে চাইলেন। তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের বোঝেন না, তাঁরা ছেলে-মেয়ে ও ঘর-সংসার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, অথবা অত্যন্ত বৃদ্ধা বা অত্যন্ত নিরুত্তাপ। দিনের অধিবেশনের শেষে

ক্লারা কি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবে? হাল্কা কিছু খাবারের সঙ্গে জরুরী বিষয়গুলির আলোচনা খুবই আনন্দের হবে। কমরেড ক্লারা কখনোই 'না' বলত না। প্রথম রাতে এটা অসম্ভব; আগের রাতে সে ঘুমোয়নি, কাজ ও উত্তেজনায় জলে। হয়ত কাল···

প্রথম অধিবেশনে বিতর্ক রাত দুটো পর্যন্ত চলল। প্রতিনিধি বা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে লড়াই করলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক জড়বাদের অর্থের উপরেই বেশির ভাগ মনোযোগ দিলেন। এক মার্কসবিরোধী ঐতিহাসিক ইহুদীদের ইতিহাসে যে জড়বাদতত্ত্ব প্রযুক্ত নয়, এটা প্রমাণ করতে তিন ঘণ্টা সময় নিলেন। কমরেড ক্লারা প্রথম সারিতে বসেছিল, মঞ্চ থেকে মেজের উপরে, আর বক্তা তার দিক থেকে দুচোখ ফেরাননি। তিনি মুষ্টি দিয়ে টেবিলে আঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলেন,—"জড়বাদ কি দু হাজার বছরের ইহুদী—নির্বাসন ব্যাখ্যা করতে পারে? হিব্রু ভাষার বেঁচে থাকা, স্বরাজ্যের জন্য ব্যাকুলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কসীয়তত্ত্ব কি ব্যাখ্যা করা সম্ভব? না, হাজারবার নয়। ভ্যাবাচাকা খেয়ে ক্লারা ঘাড় নাড়ল এবং প্রশংসায় হাততালি দিল। কমিউনিস্টরা চিৎকার করে মঞ্চে ছুঁড়ে দিল, "অন্ধবাতক, প্রতিক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী।" ঐতিহাসিকের স্বরভঙ্গ হল। তিনি গ্লাসগ্লাস জল খেয়ে চশমার কাঁচ দুটি কমালে মুছলেন। তিনি তাঁর যুক্তি মার্কস, এঙ্গেলস এবং মেজেল হেস উদ্ধৃত করে সমর্থন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কমিউনিস্টরা তাকে বাধা দিল, বিদ্রূপ করল। ক্লারা বুঝতে পারল, সে দিগ্‌ভ্রান্ত। ঐকমত্যে ঘাড় না নেড়ে সে এখন মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "কমরেডগণ, আমরা যেন আমাদের প্রগতির শক্তিগুলিকে বিক্ষিপ্ত না করি।"

ঐতিহাসিকের বলা শেষ হলে জনৈক কমিউনিস্ট তাঁকে জবাব দিতে বক্তৃতামঞ্চে গেলেন। তিনি ক্রূর হাসি হাসলেন, চশমার কাঁচের পিছনে তাঁর দু-চোখ জল জল করতে লাগল। তিনি প্রমাণ করলেন, ঐ তথাকথিত ঐতিহাসিকের ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান কোনটারই জ্ঞান নেই। ক্লারা প্রশংসায় হাততালি দিয়ে বলে উঠল: "সাবাস!" এই বক্তা আগেই ক্লারার কাছে এসেছিলেন আর ক্লারা তাঁর সঙ্গে পরে সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সোনার দাঁতে ভর্তি মুখগহ্বর ব্যাদান ক'রে তিনি বিজয়ীর হাসি হাসলেন। জিভের ডগায় ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে চুলের ভিতর দিয়ে আঙুলগুলি চালালেন। তিনি সরাসরি ক্লারার সঙ্গে কথা বললেন, তার প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বলশিভ ইহুদীরা কী খেত, রুটি না মতবাদ?" আর ক্লারা তীব্র চিৎকার করে উঠল, "রুটি, রুটি।"

দ্বিতীয়দিন ক্লারা আবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল। প্রায় সব পুরুষই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-নষ্টি করল এবং একান্তে দেখা করার একটা দিনক্ষণ ঠিক করার চেষ্টা করল। যেই মুহূর্তে কোন পুরুষ তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, অন্যজন জোর করে যোগ দিল। প্রতিনিধিরা খোলাখুলি তাকে নিয়ে ঝগড়া শুরু করলেন। অর্থপূর্ণ দিয়ে খাওয়া ও বেড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন। তাঁরা তাকে সিগারেট ও মিষ্টি দিলেন। তার অনাবৃত বাহু তাঁদের ঘামে জেজা আঙুলে ধরলেন। আরো সাহসীরা এমন কি তাকে চুমু খেতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা সবাই হাসি তামাসার গল্প বললেন, কোন কোন প্রতিনিধির স্বর, অঙ্গভঙ্গী নকল করে বিদ্রূপ করলেন এবং কোন কোন প্রাদেশিক বক্তাকে নিয়ে ঠাট্টা করলেন। তাঁদের চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। কমরেড ক্লারা ভাবতে শুরু করল যে এবার সে পালাতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে সে রাতে বিতর্ক বিশেষভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট বিরোধীরা অত্যন্ত আক্রমণী হয়ে স্ট্যালিনের অন্যতম দোষগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালালেন। বেশ কয়েকজন সমতাবাপন্ন ব্যক্তি পুরোদস্তুর ক্যাপিটালিস্টদের মত বলতে শুরু করলেন। কমিউনিস্ট বক্তা প্রত্যেকটি সামাজিক-গণতান্ত্রিক শ্লোগানের

উপর ঘৃণা ঢেলে দিয়ে সতর্ক করলেন—স্ট্যালিনবাদ থেকে একবাপও সরে আসার অর্থ প্রতিবিপ্লবীদের দিকে চলে যাওয়া। জনৈক প্রতিনিধি চিৎকার করলেন—"তোমাদের সবাইকে হাতের কাছের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলি দেব।" সভাপতি সন্ত্রাসবাদী দেখিয়ে এই অসংসদীয় বিস্ফোরণের জন্য ধমক দিলেন। হলঘর সিগারেটের ধোঁয়ার দুর্গন্ধে ভরে উঠল আর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কপালগুলি ঘামে ভিজে গেল, টাইগুলি ন্যাকড়ার মত ঝুলে পড়ল, প্যাশনে নাক থেকে পিছলে পড়ল। একটা পাখা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে করতে কমরেড ফ্লোরা চেঁচিয়ে বলল,"মাফ করবেন কমরেডরা, একটা জানালা খুলুন।" প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন এক গ্লাস লেমনেড পয়াটার নিয়ে এলেন।

রাত একটার কাছাকাছি এমন একটা হৈ-হল্লা শুরু হল যে কমরেড ফ্লোরা কোন মতে দরজার চোখের আড়ালে লুকিয়ে চলে আসতে পারল। তার প্রেমিক লুবলিনের এক চামড়ার কারখানার মালিক ফ্লোরার ঘরের পাশেই আর একটা ঘর নিয়েছিল। সে যে তার ধনতান্ত্রিক প্রণয়ীকে সঙ্গে এনেছে এটা যাতে প্রতিনিধিরা না জানতে পারেন, ফ্লোরা সেটা নিশ্চিন্ত করে রেখেছিল। সে দরজায় চাবি এঁটে ছুকো টেনে প্রনয়ীকে সাবধান করে দিল যাতে সে কোন আওয়াজ না করে। প্রনয়ী তার ঘরে ঢোকার পর কেউ একজন দরজায় টোকা দিল। লোকটা সেই ঐতিহাসিক।

"মিস্ ফ্লোরা, মিস্ ফ্লোরা, খুলুন না।" তিনি হলে ঢোকার পথে ফিস-ফিস করে বললেন। হেসে কুটিকুটি হওয়া থেকে নিছক কোনমতে ফ্লোরা নিজেকে সামলাল। সে বিছানায় শুয়ে বালিশের মধ্যে খিলখিল করতে লাগল। সেই কারখানার মালিক ফ্লোরার পিছন দিকে চিমটি কাটল, আর নীচুস্বরে তাকে "বেশ্যা," "নোংরা মেয়েছেলে" বলে গালি দিল। লোকটা তার কানের লতি কামড়ে দিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, "টোকা দিকগে ওরা, তোর চিন্তা কি? আমি তো তোর।"

তৃতীয় দিন সকালে একটা মাথাধরা নিয়ে ফ্লোরা জাগল। চামড়া কারখানার মালিক কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করতে আগেই চলে গিয়েছিল। ফ্লোরা একটা অ্যাস্পিরিন, খেল, কিন্তু তাতে কাজ হল না। সে শুধু লাঞ্চের পরেই অধিবেশনে গেল। অধিবেশন আবার হট্টগোলে বিক্ষারিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু অমরত্বের মর্যাদা-সম্পন্ন এক লেখকের বক্তৃতায় প্রতিনিধিরা নিজেদের সংযত করলেন। তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি যিনি ফ্লোরার প্রতি অবাঞ্ছিত প্রণয়-জ্ঞাপন করেননি। ষাট-পঞ্চাশের মধ্যে বয়স, ছোট-খাট, চওড়া কাঁধ, পাকাচুলভর্তি মাথা, দু-চোখের নীচে থলি, এবং সোনার রিম-লাগানো চশমা। এক তাড়া কাগজ থেকে তিনি একটি বক্তৃতা পাঠ করছিলেন। অধ্যাপকের মত তিনি ইঙ্গিত-বাহ ও সমাজবাদের পুরো ইতিহাস বলে যাচ্ছিলেন। একটানা একটা ঘুমন্ত স্বরে তিনি কথা বলছিলেন। প্রতিনিধিদের অনেকেই হাই তুলছিলেন ও বিমোচ্ছিলেন। অন্যেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। প্রতিনিধিরা ফ্লোরার দিক ঘোরাচ্ছিলেন, কিন্তু সে ভান করছিল যেন সে সেই বিখ্যাত লেখকের প্রতিটি অক্ষর শুনছে। বক্তৃতা শেষ হলে ফ্লোরা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ।"

বৃদ্ধাজ্ঞী তাঁর বাঁধানো চশমাটা খুলে ফেললেন। "আপনি সত্যি সত্যি আগ্রহ বোধ করছিলেন?

"প্রচণ্ড।"

"আমি আপনাকে লক্ষ্য করেছি—আমাদের আরো ভালভাবে পরিচিত হওয়া দরকার।"

"এটা আমার পক্ষে একটা বিরাট সম্মান!" ফ্লোরা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল।

আবার অবিলম্বে অধিবেশন টুকরো হয়ে যেতে লাগল, কারণ দুই শিবিরই অত্যন্ত আপসহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, একটা নির্বল গোষ্ঠী জিনিসগুলি জোড়াতালি দিয়ে শেষ রেখা করল এবং একটা নতুন আপস-প্রস্তাব নিয়ে হাজির

হল। ভোজের হল ঘরে টেবিলগুলি এরই মধ্যে সাজানো হয়ে গেছে। রান্নাঘরে বাবুর্চিরা হাঁস-মুরগি ভাজছিল আর এক পাত্র থেকে অন্যপাত্রে ঝোল ঢালছিল, কিন্তু অধিবেশনের হলে যুদ্ধ চলছিল। প্রতিনিধিরা একে অন্যকে ব্যক্তিগত-ভাবে অপমান করছিলেন। এক প্রতিনিধি কানে খুসি খেলেন। এক স্ট্যালিনবাদী কোন ট্রটস্কিপন্থীর দিকে একটা ঘোরাত ছুঁড়ে মারলেন। তাঁরা পরস্পরকে এই ধরনের কথা ছুঁড়ে মারলেন, যেমন "ক্যাপিস্ট কুত্তা", "জনগণের বিশ্বাসঘাতক", "উস্কানিদাতা" কিন্তু শান্তিবাদীরা অধিবেশনটাকে বিস্ফোরিত হতে দিল না। এটা ইহুদীদের একটা জন্ম হতে পারত। প্রতিনিধিদের হয় একটা সাধারণ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে, নয়তো শত্রুর মত বিদায় নিতে হবে। কমিউনিস্টরা কয়েকটা বিষয় মেনে নিতে চাইলেন, আর বিরুদ্ধপক্ষ আরো একটু নরম। তিন পৃষ্ঠার একটি প্রস্তাব খাড়া করা হল এই দাবী জানিয়ে যে বৃহৎশক্তিরা নাগাসাকের পরিসমাপ্তি ঘটাক। চীন, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার কমরেডদের অভিনন্দন পাঠানো হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সাম্রাজ্যবাদী লোভ, রক্তচোষা শোষক, এবং ক্যালীবাদ পরিত্যাগ করতে বলা হল। যাইহোক, যে সেক্রেটারী এই প্রস্তাব লিখেছিলেন তিনি একজন কমিউনিস্ট এবং বয়ান পালটে ছিলেন। এই প্রস্তাবনা ধরা পড়লে প্রতিবাদের গর্জন সুরু হল।

ঠিক সেই সময় প্রতিনিধিদের ভোজে ডাকা হল। ওয়েটারদের তাড়াতাড়ি সুরু করতে হবে: তাদের নিজেদের ইউনিয়নের নিয়ম-কানুন আছে। ভোজে বিবদমান গোষ্ঠীগুলি আরো বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন হল। তাদের টাট্‌কা রোল, ঘুলের সঙ্গে কই-জাতীয় মাছ, তরকা, সুরা, সুস্বাদুলের সঙ্গে চিকেন সুপ এবং পুর-দেয়া খাবার দেয়া হল। এক স্ট্যালিনপন্থী ও বামপ্রমিক-আন্দোলনের নেতা, যাকথানে ছোরা বসেছিল। একজন তার হাঁটুতে হাত রাখল, আরেকজন তার পাঁজরে সুড়সুড়ি দিল। ছোরা মদ্যপান করল ও জোরে জোরে হাসল। সে তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা সিগারেট রাখল আর দুজন পুরুষই পাল্লা দিয়ে দেশলাই জ্বালাল। সে একটা পোশন মিলনের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে প্রতিনিধিদের অনেকেই তার উপর চটে থাকলেও সে একটা গান করুক কেউ একজন প্রস্তাব রাখলে একটা সাধারণ সম্মতি হল।

ছোরা রাজী হবার চেয়েও বেশী ছিল। সে তৈরী হয়ে এসেছিল এক পিয়ানো বাদককে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে সে গাইল "প্রতিশোধের দিন" আর একটা উক, দীর্ঘ স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা লাভ করল। তারপর সে গাইল "ম্যারিকেন"। একটু পরে প্রতিনিধিদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু ছোরা একটি দীর্ঘ অনুষ্ঠান সূচি পরিকল্পনা করে শেষপর্যন্ত সেটি অনুসরণ করল।

অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন আমেরিকা থেকে আসা মৃত্যুঞ্জয়ী। ততক্ষণে মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বক্তৃতায় এতই জড়িয়ে পড়লেন যে তিনি শেষ করতে পারলেন না। যখন উপসংহারে আসছেন মনে হল, তখন তিনি একটা নতুন প্রসঙ্গের জালে জড়িয়ে পড়লেন। বাইরে আকাশে ভোর হয়ে আসছিল। কোন কোন প্রতিনিধি নাক ডাকাতে, অন্যেরা ঠাট্টা-তামাসা করতে, কেউবা চোখ টিপতে ও একে অন্যকে লেখা-কাগজের টুকরো চালান করে দিতে লাগলেন। ছোরাকে চলে যেতে হল তার বিপজ্জনকভাবে ধৈর্যহারা চাকরী জারখানার মালিকের সঙ্গে পুনরায় যোগ দিতে। সভার কার্যবিবরণী-নিরীক্ষক দস্তাবেজ কলম সরিয়ে রাখলেন। তিনি একবার হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়লেন। শুধু একজন প্রতিনিধি যিনি আসলে বামপন্থী হলে তানকরা পুলিশের চর ব'লে চলে যেতে পারছিলেন না, লিখতে থাকলেন, কেন না তাঁকে একটা পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে হবে।

পরের দিন সকালে ঝেরি করে ঘুমাল। যখন সে শেষবারের মত অধিবেশনের হলে গেল, তার আগেই চেয়ারগুলি সরানো এবং মঞ্চ খুলে ফেলা হয়েছে। হলটা এখন একটা বিয়ের জন্য তৈরী করা হচ্ছে। যেখানে ছোরান দিয়ে-ঢাকা একটা ভাঁজকরা চাঁদোয়া, বিশাল একটা পিতলের ট্রাম্পেট, একটা ঢাক, দুজন হাঁটু গেড়ে বসে বার্নিশ দিয়ে পালিশ করছে। ছোরা মাথা ভিতরে ঢোকাতেই একজন কর্মী চিৎ দিয়ে উঠে বলল, "হিয়ারমি, সব শেষ।" অন্যজন বলল, "কমরেড সামনের বছর আবার আসবেন, বিপ্লব টিকে যাবে না।"

সুখ

মার্সেল আরেঁলে

অনুবাদ ঃ তুষার চৌধুরী

মাদলেনের দরজা থেকে, আমি গ্রামের এক স্ত্রীলোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে পেলাম, যার গল্প বেশ চিত্তাকর্ষক।

ওর স্বামী কার্মানিতে বন্দী আর কোলেকাঁথে ওর তিনটে বাচ্চা এই অবস্থায় নিজের তাগের ঘরি দেখভাল করা যখন কঠিন হয়ে পড়ল, তখন একটা মদ্দা কাজের লোক রাখা ছাড়া ও আর কীইবা করতে পারে? সবলোকে অড়ো হওয়ায় তেমন পছন্দাপছন্দের কিছু ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত ও সবচেয়ে খারাপটাকেই বাছল, কোত-দ্য-নর্দের এক রেতঁ, যে সমুদ্রে গিয়েছিল আর ১৬ থেকে ৩২ বছরের ভেতর ঘুরে বেড়িয়েছিল এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে, নেমেছিল দুনিয়ার যত জাহাজঘাটার প্রতিটি খোঁড়লে, প্রতিটি রসাতলে; সবাইকে টেক্কা দেয়া খুবসুরত চেহারা, গাত্তর্তি উল্কি, লিভারের সিরোসিসের জন্য বাতিলের দলে। ওর হামবড়া চালচলন, মাথা বয়ে বেড়ানোর কায়দা, গলার স্বরের কাপেনি থেকে ওর ডাকনাম জুটে গেল 'কাপ্তি', মানে মাতব্বর।

প্রথম সপ্তাহের শেষে, শনিবারের রাত্রি থেকে রবিবারের সকাল, রাতারাতি মালকিন বনে যাওয়া কৃষকের বৌয়ের ওপর ও এমন প্রভুত্ব চাপাল যে বৌটি ওকে কিছুই মানা করল না, সবেতেই ওর মর্জি খাটাতে দিল, বেহিসেবী খরচ করতে দিল। যে-সব সুখ ও বৌটিকে দেখালো তা এই পুরস্কারের উপযুক্তই বটে। বৌটির দিক থেকে আরো বদান্যতা পাওয়ার জন্য চাপ দিতে বৌটি ধীরে ধীরে ওকে সবকিছু দিয়ে দিল। দিনের প্রতিটি ভোজ অনুষ্ঠানের চেহারা নিল, এক চিরস্থায়ী চড়ুইভাতি। যখন টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেল, বৌটি সম্পত্তেরার একটা অংশ বেচে দিল, তারপর আসবাবপত্তর, শেষে চাদরটাদর। খামারের ফসলের অর্ধেক গেল খানাপিনার ফুর্তিতে, বাকিটা গেল 'কাপ্তি'র ব্যক্তিগত খুশি কাঁপাতে।

১৯৪৪-এ, যুদ্ধের শেষদিকটায়, ওর জন্য দুটো সমাধান রইল : চলে যাওয়া অথবা খেকে যাওয়া। বৌটির জন্য তবু একজনই ছিল : যে কোনো মূল্যে ওকে রাখা চাই। এমন হল যে স্বামী ফিরে এলে মেয়েটি মেনে নিল ও ছেলেটির থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে চায়, তার জন্য নিজের প্রেমিকের থেকে বরং নিজের আত্মাকে হারাতে প্রস্তুত।

কাপ্তির আঁটা কর্মিটা বেশ সাহসী ছিল ও নিজে থাকবে গোয়ালঘরে, একটা গোপন-ছিদ্র দিয়ে নিচে গোয়ালে শুয়ে ওর শিকারের আসা যাওয়ার ওপর নজর রাখতে রাখতে ও একটা ছিপে দিঁটওয়ালা দড়ি নামিয়ে দেবে যেখানে দুধ দোয়ানোর জন্য দুকুর্শিয়াল (ওটাই কৃষকটির নাম) যে টুলের ওপর বসবে ঠিক তার ওপর, আর যেন ন্যাজের ঝটকায় আমার দুকুর্শিয়াল দুই হোথা এক লহমায় ফাঁস আটকে মরবে। আমার সাধারণ বুদ্ধিও এই পরিকল্পনার ভুলটা ওর নিজের চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে পারল না, যার ফল হবে কানাকড়ি আর ভেকে আনবে গুপ্তের সর্বনাশ। কাপ্তি তারই অপেক্ষায় ছিল :

'আমার নিজের চোখে আমি এইই পারি।' এই হত্যাকাণ্ডে মেয়েলোকটিকে পরিষ্কার করার এটাই ছিল তার পরোক্ষ চাল।

এবার স্বামীটির কথা শোনা যাক : আচ্ছা! যেহেতু আপনারা আমার বন্ধু, ব্যাপারগুলো কেমন ক'রে ঘেটে গেল আমি আপনাদের বলছি। চারদিন হ'ল ফিরেছি কেউ আমাকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলা দরকার মনে করল না। সর্বত্রই এটা দেখলাম। যখন যাই আটটা গরু রেখে গেছলাম, এখন দুটো, তাও খারাপ ধরা। টাকাও

নেই। সেরা সেরা আসবাবপত্তর উধাও। আলমারির চাবনা নেই। দেনার পর দেনা। কিন্তু সবচেয়ে বড় মৃত্যুতা আমার বৌয়ের বুকে। প্রথমবার যখন ওর দিকে তাকালাম, আমি সব জানতে পারলাম। তবু, কিছু বললাম না। আমি শুধু ডাক্তারকে বিদেয় হ'তে বললাম। ওর যাবার তাল নেই, তিনদিন পরেও ও বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। আমি কোনো নাটক করব না মনস্থির করলাম। নিজেকে বললাম: একবার ও রাস্তা থেকে সরে গেলে আমি বৌকে ফিরে পাব। বৌটি ছিল খুব বুদ্ধিমতী, সুরসিকা, হাসি-খুশি, যাঁযত ভালো, বাড়িটা গোছানো, নিকলঙ্ক আর তখনো একটাও কটু কথা নয়। আমার সেবায় ফিরে আসবে। আমি সবকিছু মার্জনা করতে তৈরি ছিলাম, যখন চতুর্থ সপ্তাহে, অন্ধকার গোয়াল ঘরে, যেই না ঘুষ ঘোয়ানো শুরু করব, হঠাৎ টের পেলাম কিছু একটা নরম, তুলতুলে ও গড়গড়ে জিনিষ আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, তারপর সোজা আমার মুখের ওপর নেমে এল: 'এটা কী?' আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ওটাকে আটকাই, উঠে দাঁড়িয়ে, আমার হাতের নাগালের ভেতর পড়ে থাকা খড় তোলার আঁকশিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাই। যে ঘুষ দোয়ানোর জলচৌকি থেকে সদ্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, তার পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার বৌ, ওর হাত দু'টো মুঠো করা, মুখ কঠিন, যেন পাথরের মূর্তি। ওপরে, খড়ের গাদায় বাপটি মেরে, কাদি। আমি তখনও বোকা বিস্ময়ে ভাবছিলাম ওরা আমার সাথে কী করতে চেয়েছিল। কটির কারখানার মালিক, যে গলির পাশে জালানি কাঠ সাজাচ্ছিল, আমাকে অবাক হওয়ার সময় দিল না। 'ওহে ডুকুর্শিয়াস', ও চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার হ'লটা কী? হাতে আঁকশি, গলায় দড়ি, ওভাবে কোথায় যাচ্ছ?'

'সত্যিই তাই, তের চোদ্দ ফুট লম্বা একটা দড়ি, আমার পেছনে পেছনে চলেছে, যার অন্য প্রান্ত একটা হারের মত আমার গলার চারপাশে। আমাকে ফাঁস লাগিয়ে মারার একটা পরিকল্পনা যে হয়েছিল এটা পরিষ্কার, আমার স্ত্রীর যোগসাজসও সন্দেহাতীত। ওরা দুয়ে মিলেই আমার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করেছিল। একজন সাক্ষী? তাও আমার ছিল। 'বেচারা অসতীর স্বামী মনের দুঃখে নিজেকে নিজেই মেরেছে'—প্রত্যেকে বলত। না, ধন্যবাদ আমার প্রচেষ্টাকে, আরও ধন্যবাদ এই ব্যাপারটাকে যে আমা হয়তো রাজি হয়নি বা সাহস পায়নি, অলৌকিকভাবে, আমি বেঁচে গেছি।

এই মুহূর্তে আমার জীবনের চূড়ান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে, আমি নিজেকে একটা ব্যাপারে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে, এক লহমার জন্যও আমি নিজের কথা ভাবিনি: ভেবেছি শুধু ছেলেমেয়েদের কথা। আমি নিজেকেই বলি, "ওদের মা-ই চেয়েছিল, কাজটা হাসিল করার চেষ্টাও করেছিল, প্রায় সফলও হয়ে গিয়েছিল। শুধু শেষ মুহূর্তে, করতে পারেনি। ওর হাত কেঁপে গিয়েছিল, আর সেই কাঁপুনির কাছে, ওর সেই দ্বিধার কাছে, আমার জীবনের জন্য আমি ঋণী।" সেই থেকে, আমি শুধু ভেবেছি ওকে কী ক'রে আড়াল করব, প্রতিদানে ওকে কী ক'রে বাঁচাতে পারব, কী করলে মনে হবে ও নির্দোষ, ওর নিজের কাছেও। আমি ওকে ঈশ্বরের সামনে রক্ষা করব, ঈশ্বরের বিপক্ষেও। এই ছিল আমার পণ এবং, আঁকশি থেকে আর আমার অগ্নিপরীক্ষার ধরাচূড়া থেকে ছাড়া পেয়ে, তখুণি আমি কটির কারখানার মালিককে থামালাম আর ওকে গোয়ালঘরে যেতে নিরস্ত করলাম। ঝটপট, আমি পোষার ঘরে গিয়ে আমার সেরা পোশাক পরে নিলাম। দ্রুত পায়ে হেঁটে আমাকে আট মাইল যেতে হবে। আমার দিদির এক ছেলের বিয়েতে। ওখানে আমার মা থাকবে। খোলা বাতাসে আর দীর্ঘ পথ চলায় আমার ভালোই হল, কিন্তু অন্য লোকেদের দুঃখের দুঃখের চেয়ে কিছু কম, যা আমার নিজের অস্তিত্বে নিয়ে আসছে একটি কথাও না বলার ও আমার পারিপার্শ্বিক লজ্জা আর কষ্টকে ফেড়ে ফেলার উপায় নিয়ে আপনমনে ভাবার শক্তি যোগালো।

পরের দিন ভোরে বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম কাদি চলে গেছে। দেখলাম এ আমার বউ নয়, বরং যেন ওর ছায়া, ভয় আর অনুতাপের শিকার। ও এত বিবর্ণ, যেন নিজেই নিজেকে পরিত্যাগ ক'রেছে, চুল এত উস্কোখুস্কো, যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আগের সন্ধেবেলাটার চেয়ে আরো বেশি কষ্টের মনে হ'ল।

ও নিশ্চয়ই সারারাত, আমার নালিশের ভিত্তিতে পুলিশ এসে ওকে গ্রেফতার করবে, সে জন্য প্রতীক্ষা ক'রেছে। যেসব জায়গায় আগে ছিলাম, প্রায় এক ঘণ্টা ঘোরাফেরা করে সেসব যাচাই করলাম, হয়তো কোনোদিন আর দেখাই হত না। আমার মনে হ'ল, সবকিছুই যেন আমাকে জীবিত দেখে অবাক হয়ে গেছে। অবশেষে, আমি বসবার ঘরে ফিরে গেলাম। সেখানে আমরা দু'জন একা, আলো আর আমি। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওকে শান্ত গলায় বললাম, "যদি তাই চাইতাম, তুমি জানো আজ রাতে তোমাকে কোথায় ঘুমোতে হত? আর ওকেও। কিন্তু না। গোড়ার কথা, আমাদের বাচ্চারা রয়েছে। ওদের কথাই আসল। আমাদের কথা বলতে গেলে, সত্যি কি আমরা বেঁচে আছি? আমার কথা? তুমি আমার মরা মুখ দেখতে চেয়েছিলে। আর তুমি? তোমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। একই ব্যাপার, তোমার কথা যদি বলতে হয়, তুমি আমার কী ক্ষতি করতে চেয়েছিলে সেটা বড় কথা নয়, আমি শুধু তোমার মঙ্গল চাই।

আসলে, নিজের সাথে যত তর্ক করি, আমি অসহায়, আমি ঠিক তোমাকে না ভালোবেসে পারি না। যারা মাত্র একবারই প্রেমে পড়ে আমি তাদের একজন। তাই কথা হল: যদি তুমি এই লোকটাকে ছাড়তে পার, আমি তোমার সাথে আবার জীবন শুরু করতে প্রস্তুত। যেন কিছুই হয়নি। যদি এতে তোমার অসুবিধে হয়, যদি তুমি ওকে ছাড়া না চলতে পারো, যেমন আমি তোমাকে ছাড়া, তবে, ভালোই তো! যদি তুমি তোমার সন্তানদের চেয়ে ওকেই বেশি চাও, যদি তুমি আমাকে এতই ঘৃণা কর, যদি আমার ক্ষমাও তোমার মনে না ধরে, তাহ'লে—বেশ! চলে যাও। আমি তোমাকে সেই অনুমতি দিচ্ছি, আর কথা দিচ্ছি: আমি তোমাদের দু'জনের কাউকেই বিরক্ত করব না। আমার সম্মান, আমাদের ছেলেপুলের সম্মান আমার কাছে আমার প্রতিশোধের চেয়ে বেশি জরুরী। প্রথমে ও কোনো উত্তর দিল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। "আর যাই কর, আমাকে ছেঁড়ো না।" আমি বললাম। ওর হাত দু'টো আমার পায়ের নাগাল পেতে চাইল। "এখনি আমাকে ঘাঁটাতে যেয়ো না। না। বেশি কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে। দিন যেতে দাও, আর যদি দেখি তুমি আমার মনের সাথে তোমার মনের মিল খুঁজে পাচ্ছ, যখন আমি টের পাব লোকটার থেকে তুমি যা চেয়েছ তা ফুরোবার পর আমার প্রতি যথেষ্ট বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে, তখন আমরা ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছে আসব এবং সম্ভবত যদি কিছু না ও হ'ত তার চেয়েও বেশি আনন্দে।" "তুমিই ঠিক", ও বলল। "আমাদের ভেতরে, কোনো নাটক নয়। শুধু দুটো কথা আমি তোমাকে বলতে চাই: সেই রাতে, আমি নিজেকে দেখলাম আমি কী হয়ে গেছি, আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমি তোমাকে দেখলাম সেই তুমি, পৃথিবীর সেরা লোক, যাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা-ই সব, আমি শপথ করছি, তুমি আমাকে অন্যরকম ভেবো না। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠব।" সে তার কথা রেখেছিল।

আমি জেনেছি ও একবার কাদির খোঁজে গিয়েছিল, গিয়েছিল ওদের মধ্যে সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে সে কথা জানাতে আর আমার গুণ গাইতে। ওর দোষগুলো সত্ত্বেও হতেই ও সেসব ভুলে নিয়েছিল। ওর প্রতিজ্ঞা থেকে ও কখনো পেছপা হয়নি। সেই থেকে আমার কাছে, ওর ছেলেমেয়েদের কাছে আর বাড়ির কর্ত্রী হিসেবে ও ছিল নিখাদ উর্বশী। দু'মাসও যায়নি আমরা আবার এক বিছানায় শুচ্ছিলাম। একেবারে সুখী জীবন।

সেই মহিলাটি যে আমাকে বলেছিল দুনিয়ার যা যা বলেছিল, এই ব'লে ওর কথা শেষ করল: 'যখন ও চলে

গেল, ওর আত্মা আমাদের এত আবেগাপ্লুত করল যে আমি আর আমার স্বামী অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে, তারপর বলে পড়লাম, বাকরুদ্ধ ; আমাদের দু'জনের চোখেই জল।'

গাঁয়ে একটা সর্বজনীন বিস্ময় দেখা দিল। কটি প্রস্তুতকারক এত বেশি বলে বেড়ালো যে নাটকের মর্মবাণী নিয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যদি এই একমাত্র লোকটি নাটকের শেষটুকু দেখেছিল, ঘটনাগুলো এমনভাবে উপস্থাপিত করল ঠিক যেমন কাদি শুরু থেকে ছকেছিল, আর এত সফলও যে এটাই গৃহীত ব্যাখ্যা হয়ে উঠল যে কাদিই নাটকটি নামাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে চাষীর বৌ জড়িত নয় বলে মনে হয়েছিল, তবুও তাকে ত্রাণ করল না কারণ এতে বৌটির বহু আচরণের সায় ছিল। তদুপরি, গাঁয়ের লোক দুকুর্শিয়ালকে ঘৃণার চোখে দেখল কারণ প্রত্যুত্তরে ওরা দুর্বলতা ব'লে ঠাওরাল, হীন যোগসাজস হিসেবে, আর এই কথা ঘাতালে পাক খেতে লাগল : 'অসতীর স্বামী হেরে গেছে। গলায় ফাঁস পরে এখন সে সুখেই আছে।'

তাই, জনমত অস্বীকার করতে বা সেটা বদলানোর আশায়, প্রসঙ্গ উঠলে যদি দুকুর্শিয়াল সাবধানী হয়ে ও সর্বান্তঃকরণে বৌয়ের গুণ গাইত, লোকে তাবত তান করছে। শুধু উপহাস করে শান্ত হত না লোকে ওর বদান্যতার বদলে ওকে অপমান করত।

এক কি দু'বছর পরে, সবাজের যাদা কাটিয়ে ওঠার আশায়, অভাগা দম্পতি নিজেদের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে জনসমক্ষে দেখা দিল, হাসিখুশি। যেমন বরুন গ্রামে মোজেবে নাচতে গেল, সবসময় একসাথেই নাচল। 'আপনি ওয়াল্‌স পছন্দ করেন, মঁসিয় দুকুর্শিয়াল ?' এক নাচের অনুষ্ঠানে মাদাম আপ্রস্ক ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল। 'আসলে কি জানেন, মাদাম আপ্রস্ক, "পুরোনো দিনের" কথা স্মরণ করতেই আমি আর আমার বৌ মাঝে মধ্যে একটু পাক খেতে চাই।' 'আজকের নাচটা কিসের, মঁসিয় দুকুর্শিয়াল ? 'নাচতে নাচতে আমরা নাচ শিখি। দুঃখের প্রেমে পড়াটাই বড় কথা।'

এই প্রসঙ্গে মাদাম আপ্রস্ক উল্লেখ করলেন, ওকে সম্বোধন করতে বা ওকে নিয়ে কথা বলতে গেলে, উনি ওকে সবসময় মঁসিয় ব'লে ডাকতেন। 'উনি একজন কৃষক হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সর্বোচ্চতম সম্ভ্রান্তদের মধ্যে পড়েন। আমি ওকে শুধু শুধু সম্মান করি না, শ্রদ্ধাও করি। যা কিছু প্রশংসনীয় ও সুন্দর তাই অবাক করে, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিস্ময়াবিষ্ট করে আর ইতরদের আহত করে।'

একদিন গমযাড়াইয়ের পর এক ভোজসভার মধ্যিখানে এক আন্তাবলের চাকর, যার মুখে অশান্তি এবং খামিকটা রক্তও লেগে রয়েছে, টেবিলের তলার দিক থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল : 'আহা! বেচারা দুকুর্শিয়াল, তুমি কী করো কী বলো তাতে কিন্তু যায় আসে না, আমরা তো লটারি জিতিনি। আমাদের বৌদুটো এক জোড়া বেজন্মা, কিন্তু তোমার আনা আমার ফেনেলার চেয়ে একটু বেশি খারাপ। ফেনেলা আমার গলায় ফাঁস লাগানোর কথা কখনো ভাবেনি। এমন অশুভিকর মুহূর্তে, চোখের পাতা নামিয়ে, মাথা উঁচু রেখে ও এমন কোনো গভীর লোকের লোকের দিকে এগিয়ে যেত যে ওকে বিষয়টা পাল্টানোর সাহায্য করতে পারে। সেদিন প্রসঙ্গটা ছিল সরাসরি। ও না শোনার ভান করল, ছাতের দিকে চোখ তুলল। এর ওপর আরও ইতর কে একজন বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না ছবি নেবে আসছে ?' এরপর বেরিয়ে আসা ছাড়া ও কী করতে পারে !

মেয়েরা বলত ও নাকি লাফিয়ে দিতে দিতে কাঁদত। যদি সত্যি কাঁদতই, তবে সুখে, ধৈর্যের দ্বারা একটি দুর্ভাগ্যকে কাটিয়ে ওঠার যথেষ্ট শক্তি থাকার সুখে। ও সত্যিই নিজেরই জন্য এই সান্ত্বনা ব'য়ে বেড়াতে পারত, যে ভালো করার ফলের এক খারাপ ফল হ'য়েছে, যে ওর অন্তঃকরণের যাচ্ছাচ্ছা পরিস্থিতির ও মানুষের বিদ্বেষের

বিরুদ্ধে এক জয় অর্জন ক'রেছে, যেমন সন্তদের দেখা যায় তাদের হত্যাকারীদের বা বর্বর পশুদের হৃদয়কে কোমল করতে। বলুন, এটা কি চাট্টিখানি কথা, একবার এমন একটা ভীষণ ও আতঙ্কজনক অবস্থায় পড়া ও তা থেকে নিজেকে সুবিধাজনক জায়গায় ফেরানো? যে রোগটা শত্রু হ'য়ে উঠেছিল এবং ওকে ফাঁসি লেগে মরতে দেখতে চেয়েছিল, তা থেকে একটু একটু ক'রে ওকে বদলে গিয়ে এখন যে ওকে পুজো করছে, ভগবানের মত। তিরিশ মাইলের ভেতর, প্রকৃতই, ওদের হাসপাতাল ছিল সব চেয়ে বেশি সুটুট, এবং সেটা বেশি টের পাওয়া যেত যে ওদের হাসপাতালগুলি হয়ে উঠেছিল কিম্বদন্তী, মানুষের বোধমান্যতার অতীত।

এটা আরো বোঝা গেল যখন আনা অসুখে পড়ল। এমন কোনো খরচা ছিল না যা ছকুর্শিয়াল করতে চায়নি, এমন কোনো পরমার্শ নেই যা ও নেয়নি। ডাক্তার, অধ্যাপক, হাসপাতাল চিকিৎসক, বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক, সবাইকেও ওর বৌয়ের রোগশয্যায় ডাকিয়েছিল, ওকে সারাতে, যত শীঘ্র ওর কষ্ট লাঘব করা যায়। ওর পুরো মনোযোগ ছিল, ওকে কোলে ক'রে খাওয়া নেয়া, ওকে বাওয়ানো, নিজে ওর মুখে ভাত ধরা, কারুর সাহায্য না নিয়ে বা নিজের শক্তিসামর্থ্যে যতটা পারা যায়। বৌয়ের মৃত্যুশয্যার ওপর থাকার দু'সপ্তাহ ধ'রে, ও চোখ বোজেইনি বলা যায়।

মাদেলিনের দরজা থেকে আমি দেখলাম ও এগিয়ে আসছে, প্রায় ওজনহীন, শরীরহীন, লম্বা পাতলা, প্রায় ভাবলেশহীনমুখ, কফিনের ঠিক পেছনে। মুখ চাকা শাদা নির্মল রুমালে, যেটা ও দাঁতে চেপে আছে।

ও চলে যাবার পর, এলিজা যে কিনা সব সময় শেষ উক্তিটি করে, ঘোষণা করল :

'অবশেষে, এই এক প্রকৃত খৃষ্টান।'

কেউ জিনিসটা এভাবে নেয়নি।

আমাদের চারপাশের বোকা সোকা মেয়েরা, কানা-খোঁড়া মাগীরা, ছাপোষা মানুষেরা লোকটার ছায়াশরীরের দিকে কটমট মুখে তাকিয়ে রইল যার সবটাই ওদের দুর্বলতা আর বোকামি ব'লে মনে হ'ল, চেয়ে রইল ধীরের পায়ে পরিচালিত উলঙ্গ শবযাত্রীর দিকে। আর পাঁচজনের মত আচরণ না করার জন্য, সাধারণ স্তর থেকে ওপরে উঠে যাওয়ার জন্য, উঁচুতেই—মেয়েটি খারাপ কাজে, ছেলেটি ভালোয়—দ্বিতীয় শ্রেণীর সাব্যস্ত না হওয়ার জন্য ওরা দু'জনের কাউকেই ক্ষমা করতে পারল না। যারা এই নাটক বুঝতে পারল না তাদের মুখের ওপর স্বর্গের দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবে, আর এই দু'জন পরমের স্পর্শন জেনেছিল এবং বলতেও পারত—কিন্তু ওরা কি এটা জেনেছিল?—যে ওরা "ঈশ্বরের মহিমা" দেখেছিল, সন্তদের যাঁর আলো প্রতিফলিত হয় আমাদের নিজেদের মুখের ওপর, যখন, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিগুলোয়—যেগুলো তুলে ধরে আমাদের ভেতরে যা শ্রেষ্ঠ—ওরা ফিরে পায় ওদের ঈশ্বরের প্রথম মহিমা।

যে-রোগ আমাকে নিয়ে গেল তার নাম জানা গেল না।

পরদিন সকালে কৌতূহলবশত আমি সেই ছুতোরের কাছে গেলাম যে মেয়েলোকটিকে কফিনে রেখেছিল : আহা! আমি সব বয়সের সব অবস্থার মৃতদেহই কফিনে শুইয়ে দিয়েছি। এটা আমার কাজ। কখনো এমনটা দেখিনি। ইতিমধ্যেই সে (রোগেরই কারণে) জীবনের শেষ কয়েকমাসে বিশৃঙ্খলাগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল, যেন চামড়ার নিচে ওর মাংস গলে ঘন তরল হয়ে গিয়েছিল; মৃত্যু পেরিয়েও সে এমন ফুলতে লাগল যে তার মাথাটা একটা বাদী ঘোড়ার মাথার মত হয়ে গেল আর আমার মেয়ের কোমরের মত পুরু, বাকি দেহটাও সেই অনুপাতে; কফিনের জন্য ওর মাপজোক নেয়ার পরে, ওর দুই হাতও ফুলে উঠল, যার ফলে ওকে কফিনে চোকাতে গিয়ে ওর দুই কাঁধ আমাকে একলাথে ধাঁকতে হ'ল, পা থেকে মাথা অব্দি ঘুষে ফেলতে হ'ল। প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল ও ফেটে যেতে পারে। যখন আমরা ওকে বিছানা থেকে তুললাম, আপনারা ভাবতেন ও একটা বাচ্চেলরীবা যদি আর কেউ কি আন্দাজ হ'লাম, আকারের তুলনায়—ওর শরীর কী হালকা। একবার তক্তাগুলোর মধ্যে ওকে বাগাতেই ও হারিয়ে গেল, মন আনাচ-কানাচ ভরাট ক'রে ছিল, হাতে চলা মেই যা মেলির মত, ওর মুখমণ্ডল যা ওর সৌন্দর্য লুপ্ত হ'ল না, কিন্তু আমরা বলতে প্রায় কিছুই রইল না, যেমনতে ব'লে গেল, যেসব চেহারা আমরা খোদাই-করা দেখি মেজেলে বা রঙ্গচিত্রে।

পুরোনো সেই দিনের কথা

ভাসিলি বেলভ্

অনুবাদ : অর্ণব ভট্টাচার্য

মিউ ইয়ারের ঠিক পরে পরেই যখন বোঝা গেলো গাইটা গাভীন হয়নি, একেবারে ভেঙে পড়লো ইভান্ আকানাসাইচিচ্। তার বউয়ের মনটাও গেলো বেশ দমে ; গোটা শীতটাই তো তারা দুধের ভরসায় কাটিয়েছে, মাঠে নতুন ঘাস গজানোর আগে অবধি ঠেলে খড় খাওয়ানো হয়েছে গোরুটাকে, আর এখন শেষমেষ কি না ওদের এভাবে ডোবালো ও, কাঁধটাকে একটু ঝাঁকানো ছাড়া কিছুই করার নেই ইভান্ আকানাসাইচিচের। যদি দুখানাও গাই থাকতো টেনেটুনে, একটা-না-একটা ব্যবস্থা করা যেত নির্ঘাত, এক গামলা নোনা মাশরুম আর নোনা শসা এখনো মজুত আছে ঘরে, কিন্তু এ-বসন্তেই সবেধন নীলমণি তাদের ছোট্টো নাতনীটি—সেই যে কি না আর্কএঞ্জলসে থাকে—থাকতে আসছে তাদের কাছে, হায় রে, ওর জন্য এক ফোঁটাও দুধ যদি যোগাড় না হয়, প্রাণটা যে কেটে যাবে ওদের।

"ঘটেই তো, মন খারাপ হওয়ার মতোই ব্যাপার বটে," বেশ ঘরদ-মাখানো গলায় বলে তাদের প্রতিবেশী রাইলভ্। "একটু মুড়ি-টুড়ি মেখে খাওয়ার মতো দুধও যদি না থাকে, তবে আর কী আমোদ পাবে আবাদের লোনামরি। তার ওপর আবার শহুরে মেয়ে, এমনিতেই একটু রোগা-ভোগা।"

একথা শুনে ইভান্ আকানাসাইচিচের প্রাণটা আরোই হু হু করতে লাগলো, আর তারপর একদিন ওই প্রতিবেশী রাইলভ্ই বাতলালো বাঁচার উপায়। কোথায় যেন সে শুনেছে যে রামেনাইয়ে—পনেরো কিলোমিটারের মতো দূর হবে জায়গাটা—এক বুড়ী নাকি তার গাভীন্ গাইটাকে বেচে দিচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে—মাংসের জন্য। রাইলভ্ বলে সেই বুড়ীটাকে চিঠি লিখতে,—আর তারপর, কথাটা যদি সত্যি হয়, ওই বুড়ীর সঙ্গে গাই বদলা-বদলি করে নিলেই চলবে, কারণ মাংসের জন্য যে কোনো গোরুই সমান। ঠিক এই কাজটাই করলো ইভান্ আকানাসাইচিচ। একখানা চিঠি ছাড়লো সে, আর পরের হপ্তায় জবাব পেলো যে আর কালক্ষেপ না করে শীগগির-শীগ গির যেন সে গোরুটাকে নিয়ে চলে আসে, তারপর না হয় কথাবার্তা বলে একটা চুক্তিতে আসা যাবে।

"যাঃ, তাহলে, তো বেশ ভালো খবর, কী বলো আকানাসাইচিচ", ব্যাপারটা শুনে-টুনে রাইলভ্ বলে। "আর কী, এবার গাই বদলে নিলেই হলো, আর এ তো একেবারে খাসা গাই, কেমন নাদুস-নুদুস চেহারা, ঘোড়ার মতো গায়ে-গতরে, পাঁজরায় হাত বোলাই যায় না।"

পরের দিন ইভান্ আকানাসাইচিচ্ তৈরী হয় রামেনাই যাওয়ার জন্য, একজোড়া নতুন কেন্টের বুট পরে, পুরু চাপকানটা চাপায় গায়ে, গলায় ঝুলিয়ে টান দেবার মতো একটা ছড়ি পাখায় তারপর ঢোকে গোয়ালঘরে। চুপিসাড়ে চোখ মুছতে মুছতে তার বউ এসে দাঁড়ায় পেছনে, এতগুলো বছর ওদের সঙ্গে কাটিয়েছে গাইটা, ওর ওপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছে মহিলার, ওকে যেতে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে তার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়ে ইভান্ আকানাসাইচিচ্, সন্ধের আগে ফিরে আসবে এমনটাই ইচ্ছে। বাইরেটা বেশ গরম, বেশ উষ্ণ-সুদুস, আর রাস্তাটাও খাসা। গোড়ার দিকে গাইটা একটু যে বেয়াদবি করছিলো না তা নয়, মাথা ঝাঁকিয়ে একবার ভেঙে ছুট লাগায় তো গোঁয়ারের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে

এক একবার, কিন্তু খানিক পরেই একেবারে শান্ত-স্থির নদীটি হয়ে গেলো সে, এতটাই যে পথে যেতে যেতে সিগারেটে বার কয় সুখটান দিয়ে নিলো ইভান আকানাসাইভিচ্। রোদের তাত চলে গিয়েছে ততক্ষণে, ভিজে ভবভবে হয়ে থাকায় পায়ের নীচে আর কড়মড় করছে না বরফ। জায়গায় জায়গায় কেমন থকথকে নরম হয়ে গিয়েছে রাস্তা, আটচালা আর খড়ের গোলাগুলোতে জমে উঠেছে গাঢ়তর গাঢ় অন্ধকার। অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো না করলেও বেশ জোর কদমেই পা চালালো ইভান্ আকানাসোইভিচ্। তার লম্বা জীবনটাকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলো সে, আর এরই মধ্যে কখন যে য়াম্নোইয়ে পৌঁছে গেলো নিজেই তা ঠাহর করতে পারলো না।

এ-গাঁয়ে প্রথম যেবার সে এসেছিলো তারপরে কেটে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময়। যুদ্ধের আগে আলকাতরা কিনতে সে আসতো এ-গাঁয়ে, সেই যে সময়টায় ওরা রেজিন্ থেকে আলকাতরা তৈরী করতো বিক্রীর জন্য। কিন্তু তার পরে আর এখানে আসা হয়নি, এরই মধ্যে গ্রামটা যে কীভাবে কুঁচকে এমন ছোটো হয়ে গেলো—ভেবে তারি অবাক লাগে তার। এপাশের একসারি কুঁড়ে তো একেবারেই অদৃশ্য, আর ওদিকের ঘুটো সার এমন পাতলা হয়ে গিয়েছে যে আধা-কোকলা একটা মুখের মতো দেখতে লাগছে ওদের—এদিকে একখানা বাড়ী তো ওই ওদিকে একটা,—মাঝখানে বেশ কয়েকগজ ফাঁকা জমি চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে।

কাজেই এক মহিলাকে পেয়ে তার কাছে ইভান্ আকানাসাইভিচ্ সেই বুড়ীর খোঁজ করে, যার সঙ্গে তার পাই বদলানোর কথা। মহিলা আঙুল দেখায় চেরীগাছওয়ালা মস্ত এক ফ্ল্যাশবোর্ডের বাড়ীর দিকে। বাড়ীর পেল্লায় দরজাটায় একখানা লড়কি গুঁজে আগল দেওয়া আছে।

"কিন্তু ভাববেন না দাদু, ওই লড়কিটা লোক-দেখানোর জন্য, বুড়ী ঘুমলেও খবরদার দরজার বাইরে আসে না।"

অতএব ইভান্ আকানাসাইভিচ্ কাঠ-কোপানোর জন্য রাখা গাছের গুঁড়িটাতে সাইকেলটাকে বাঁধলো কষে, তারপর ওই আগল সরিয়ে দরজায় দিলো ঠেলা। ভেতর থেকে খোলাই ছিলো দরজাটা। দু-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলো সে।

"কাল রাতে ভালো ঘুম-টুম হয়েছে তো?" ইভান্ আকানাসাইভিচ্ জিজ্ঞেস করে নরম গলায়, বলতে বলতে হাতের দস্তানাগুলো খুলতে থাকে সে।

"হ্যাঁ, তা বেশ ভালোই হয়েছে, আপনার শরীর-টরীর ভালো তো", জবাব দেয় বুড়ী। টেবিলে বসে একটা অ্যাপ্রন বা টেবিলক্লথ—বা ওই রকমই কিছু একটা সেলাই করছিলো সে। বাস্ তৈরীর খাসির সঙ্গে ম-ম করছিলো ঘরটা। ইভান্ আকানাসাইভিচ্ একটা বেঞ্চে বসে পড়ে, আর তখনি এক ঝলকেই চিনে ফেলে বুড়ীকে।

"আরে কনস্তান্তিনোভ্না—ও, তাহলে তুমিই। বাপ্‌রে বাপ, কতগুলো বছর তোমাকে দেখি না বল তো! বাহ্, বেশ্, বেশ্—দারুণ একটা চমক পাওয়া গেলো—তাই না!"

বুড়ী তাকিয়ে দেখে, তারপর আবারো তাকায়।

"কী জানি কেন আপনাকে কিছুতেই তো আমার মনে পড়ছে না। দাঁড়ান, দাঁড়ান—ইভান আকানাসাইভিচ্ নয় তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই ছোকরা,—কত সময় হবে ঠিক,—কম করে ঘুড়ি বছর। হ্যাঁ ঠিকই তো, বয়সটিও তো হয়েছে ভালোই—আর আমারো তো কম হলো না। বুঝলাম, ওগো ছেড়ে খোকা, এই তাহলে ব্যাপার",—বুড়ী মুখের হাসি হাসে। কোলের ওপর কাপড়খানা রেখে বুড়ী সেলাই করেই চলেছে একমনে। "তারপর তোমার খবর বলো, দিনকাল কেমন কাটছে তোমার, আর তোমার খোকাখুকু, ওরা সব কোথায়—বলো, সব-কথা বলো আমায়; আরে তোমার গলার আওয়াজ না শুনলে তোমায় তো আমি চিনতেই পারতাম না, গলার

আওয়াজটাই যা এক ঘরে গেছে তোমার।" যতক্ষণ কথা বলছিলো ক্রমাগত মাথা নেড়ে চলেছিলো আনা কনস্তান্তিনোভ্না।

মাথা নাড়ছিলো ইভান আকানাসাইভিচ্ও। কত কথাই মনে পড়ছিলো ওর, আর স্মৃতির গহন থেকে উঠে আসছিলো সংলাপ। ফের ফের তিনিশ বছর আগে, তখনো কোলখজ্গুলো এখানে সেখানে দেখা যেত না তেমন করে, ইভান্ আকানাসাইভিচ্ তখনো এক পুঁচকে ছোঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আনাকে নিয়ে সটান বেরিয়ে এসেছিলো সে, ভেবেছিলো। তাকে বিয়ে করার কথা, কিন্তু তারপর সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। সে বিয়ে করলো অন্য একটি মেয়েকে, যার আনাও বুলে পড়লো অন্য এক পুরুষের গলা ধরে, যে-পুরুষের প্রতি তেমন কোনো টান আগেই ছিলো না তার, পরবর্তী জীবনে এ কথাটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে বারবার। তারপর আরো একবার দুবার তার পুরাতন সেই অগ্নিশিখার সাক্ষাৎ পেয়েছে বটে ইভান্ আকানাসাইভিচ্, আর তারও পরে বিস্মৃতি এসে গ্রাস করেছে তার অতীত জীবন। আর আজ যখন আবার দেখা হলো, মনে মনে ভাবে সে, বুড়ো হাবড়া হয়ে গিয়েছি আমরা, কিন্তু তবু দেখো, কেমন চটপট মনে পড়ছে সবকিছু।

"জীবনটা কেমন হাত-পলে ফস্কে গিয়েছে, না?" ইভান আকানাসাইভিচ্ তার পুরু চাপ্কানটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো একটা পেরেকে। "এই ওদিকের ঘুঁটিটায় কাছে তোমার সঙ্গে বসে ছিলাম—যেন কালকের কথা। হ্যাঁ, কালকের কথাই তো—আর মজাটা দেখো, পঁয়ত্রিশটা বছর এর মধ্যেই পার।"

"সত্যিই তো!" আনা কনস্তান্তিনোভ্না একবার ভোলে হাতখানা, তারপর কেমন হতাশায় ঝুলে পড়ে আসে সেটা। "ঠিক যেন স্বপ্ন, স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেলো সব, ঠিক যেন কোনোদিনই বেঁচে ছিলাম না আমরা, ঘটেনি কোনোকিছুই।"

"হ্যাঁ, তবু ছিলো তো, আনা, ছিলো তো সবকিছুই, আজো আমি জানি না কেন ওই সময়ে সবকিছু অমন গুলিয়ে গিয়েছিলো আমাদের।"

"ওহে বেড়ে খোকা, যা অতীত, যা কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে, হিসেব চুকেবুকে গিয়েছে যার তা নিয়ে এত ভেবে কী লাভ বলো তো?"

"হ্যাঁ গো খুকুমণি, সেইটাই তো মজা, সবকিছুই হারানো, সব ফুরোনো, কিন্তু তবুও তো…"

"মজা! হবে হয়তো। অতীত সব, হারিয়ে গিয়েছে সব, তবু সেদিন কিন্তু দোষটা তোমারি ছিলো, ইভান্, তোমারি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে কীভাবে সেই সন্ধ্যের নাচের আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে তুমি, আমার বাড়ী তখন লোকে লোকারণ্য।"

"কিন্তু তুমিও তো, আনা, গুলেখাকে সর্বক্ষণ আড়চোখে দেখছিলে তুমি, আর সেই মুহূর্তে মনে মনে আমি ভেবে নিলাম যে যদি আমার চোখ সবসময় গুলেখার ওপর থাকে তাহলে তো খেল্ খতম। তারপর ওকেই বিয়ে করলে তুমি, ওই ধনুকের হাসওয়ালা ঘুঘুর লোকটাকে, তাই না?—তারপর তো তুমি সিলিনোতে চলে গেলে, ঐ রাসেনাই এ এসে জীবনে?"

"সে বছর আকস্মিক এক আগুন লাগলো, পুড়ে খাক হয়ে গেলো আমাদের বাড়ী, তারপর রাসেনাইয়ে এই বাড়ীটা কিনলো ও, আমরা এলাম এখানে, তিন-তিনটে বাচ্চা হলো আমার—দুখানা ছেলে আর একটি মেয়ে। কিন্তু যখন লড়াই বাধলো, ছেলেগুলোকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠালো ওরা, প্রথমটায় ওরা ছিলো কোশাকে, তারপর একদিন মারা গেলো দুজনেই। আমার স্বামীকেও ওরা নিয়ে গেলো দুর্ভোগে-এ, সেবার ব্যাটালিয়নে ছিলো ও—হ্যাঁ,

তারপর ছাড়া পেয়ে ফিরে এলো, স্নান করে ঈষৎ চালিয়ে দিলো একদিন, মেয়েকেটে হপ্তাখানেক বেঁচে ছিলো, তারপর সব শেষ। মেয়ে বারমানক যাবার আগে অবধি ওর সঙ্গেই ছিলাম এতদিন। ওখানেই বিয়ে করেছে মেয়ে, অতএব বুঝতেই পারছো আমি এখন একা, এই গাইটাকে কিছুতেই লামলাতে পারছি না আমি, জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছে আমার, গাঁয়ে বসে এত খড় কাটা সম্ভব নয়, আর কোনখড়ের জন্য খড় কেটে তাল মেওয়ার মতো গায়ে তাগদ নেই আর। তাই ভাবলাম কসাই-এর কাছে বেচে দিই গাইটা।"

"কিন্তু আমি যে আমার গাইটা বদলাতে এনেছি, আনা, দরজার বাইরে রয়েছে ওটা।"

"সেটা আমি আন্দাজ করেছি ইভান, আন্দাজ করেছি, ওটাকে বরং তুমি ভেতরে এই উঠোনটায় নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ সামোভারে চা চাপাই ; তারপর না হয় ঠাণ্ডা মাথায় বসে একটা চুক্তি করা যাবে।"

ইভান আফানাসাইভিচ্ বাইরে এলো। ওই পেল্লায় দরজাটা একবার খুলতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ইতিমধ্যে কোত্থেকে খানিক বরফ উড়ে এসে জমা হয়েছে, ফলে নড়ানোই যাচ্ছে না দরজাটা। একটা কোদাল যোগাড় করে চুপিয়ে চুপিয়ে বরফ সরালো সে, বেশ কষ্টেসৃষ্টে দরজাটা খুলে ভেতরে নিয়ে এলো গোরুটাকে। আনা কনস্তান্তিনোভনা বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

"ওকে একটু খড় খেতে দাও, ইভান, এখন আর খড় জমিয়ে রেখে কীই বা হবে, ওইটুকু খড় রাখা না-রাখা সমান, বিক্রীও করা যাবে না।"

"ঠিক আছে, আনা, যেটুকু খড় আছে ওকেই না হয় দিচ্ছি", কাজটা সেরে ঘরে ঢুকে আসে ইভান আফানাসাইভিচ্।

"তাহলে, খুড়োমণি, এরই নাম জীবন, কী বলো ?" বেঞ্চে বসে একখানা সিগারেট ধরায় ইভান আফানাসাইভিচ।" আমার বুড়ী মার আমি—আমরাও খুব একা। আমাদের ছেলেপুলেরা সবাই চলে গিয়েছে—আলাদা আলাদা জায়গায়, একজন বারমানকে রয়েছে তোমারটির মতো। দুজন যুদ্ধে মারা গেলো, আর একজন বারমানকে। আমাদের সমতি ভালোই, বেঁচে থাকবার পক্ষে যথেষ্টই, কিন্তু ছেলেপুলেরা না থাকলে সব কি আর ভালো থাকে।"

"তোমার কোলখজ্‌টি কেমন ?" সামোভারে চাপিয়ে প্রশ্ন করে আনা কনস্তান্তিনোভ্‌না।

"সে আর কী বলবো মাসীমা, 'ওয়ার্কতে ইউনিট'-এর দিন শেষ হয়েছে তা সত্যি, তুমি নগদ টাকার মাইনে পাচ্ছো এখন, কিন্তু মনে হয় না খুব একটা তফাৎ তাতে হয়েছে। মজুত মাল বাড়িয়ে একটু আধটু কামাই হয় বটে, কিন্তু আরো যে-সমস্ত কাজের ঝামেলা সামলাতে হয়, হাড় মাস কালি হয়ে যায় তাতে। তবু মোটের ওপর বলতে গেলে, অবস্থাটা আগের মতো নেই, একটু ভালোই হয়েছে বলতে হবে। আমাদের চেয়ারম্যান লোকটা মন্দ নয়, মাথাটাও খোলতাই, কীভাবে আরো বেশী শস্য আরো বেশী দুধ মজুত করা যায় সেই ধান্ধায় সর্বদাই ব্যস্তিবাগীশ, তাবটা যেন একটা দারুণ চমকপ্রদ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।"

সামোভারে গুনগুন শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে, তারপর হিসহিসানি। আনা কনস্তান্তিনোভ্‌না ছুটো কাপ আর একটা চিনির কৌটো সাজিয়ে রাখলো টেবিলে, একটা বড়োসড়ো বান্ কাটলো, নামিয়ে আনলো কাবুলি দেওয়া বাঁধাকপিটা, তারপর কাপে ঢেলে দিলো চা। ইভান্ আফানাসাইভিচ এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে, চুমুক দেয় চায়ে, আর শুনে চলে আনা কনস্তান্তিনোভ্‌নার কথা, মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দেয়, একটা ছুটো মন্তব্য করে এখন তখন, আর ছুই ছুড়ো বুড়ী মনপ্রাণ ঢেলে করে চলে পুরোনো দিনের গল্প।

"একদিন অফিস থেকে বেরিয়েছি, আনা ; চারদিকে তখন নিশুত অন্ধকার—হাতছুটোকে চোখের সামনে

ভুলে ধরেও দেখতে পাচ্ছি না। বোর্ডের মিটিং চলেছে রাতদুপুর অবধি। একা একাই বাড়ী ফিরছি, গির্জার কাছাকাছি এসে—রাস্তাটা তুমি তো চেনোই—তো সেই গির্জার কাছাকাছি যেই না এসেছি হঠাৎ কেন জানি না—ঠিকমতো বোঝাতেও পারবো না—ভয়-ভয় করতে লাগলো, না ঠিক আতঙ্ক নয়, কেমন একটা অস্বস্তি, গা-ছমছম্। হঠাৎ হঠাৎ একটা ঘণ্টার টুংটাং শুনতে পেলাম, যেমন ওই সোফটকর গলায় কোলানো থাকে,—আওয়াজটা আসছে বাঁ দিকে বেশ খানিকটা দূর থেকে। মনে মনে ভাবলাম কাছেপিঠে কোথাও ঘোড়াটোড়া আছে নিশ্চয়ই। তো মনকে এভাবে বুঝিয়ে হাঁটতে লাগলাম, হাতের লাঠিটা রাস্তায় ঠুকে ঠুকে যাচ্ছি যাতে গর্তে-টর্তে না পড়ি, কিন্তু আবারো বেজে উঠলো ঘণ্টা, এবার অবশ্য বাঁয়ে নয়, ডানে। এবার আমার অবাক হবার পালা—আমি জানি যে আওয়াজগুলো এখন জানালীর জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে তো কাছেপিঠে ঘোড়া থাকার কথা নয়। যাহোক, তবু হাঁটতে লাগলাম, আর এবারে আমার পেছনে বাজতে লাগলো ঘণ্টা—ছোটো এতটুকু একটা ঘণ্টা, ধ্বনিতে যেমন লাগানো থাকে, খুব হালকা মিনমিনে একটা আওয়াজ। হ্যাঁ, এইবার আমি থামলাম, বিশাল এক অন্ধকার তাঁবু হয়ে রাখার চেপে বসেছে যেন। সবেমাত্র গির্জার কাছাকাছি এসেছি তখন, সাদা দেয়ালটা সবে ঠাহর হচ্ছে চোখে। তখনি আবার বড়ো ঘণ্টাটা বেজে উঠলো, পরক্ষণেই ছোটো ঘণ্টাটা, আওয়াজগুলো যেন আরো কাছে চলে এসেছে, আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। লাঠিখানা এদিক-ওদিক বেপরোয়া ঘোরাতে লাগলাম, মাথাটা কেমন যেন ফ্লাসের মতো ফাঁকা লাগছিলো। সারাজীবনে কোনোদিন এইসব অলৌকিক বস্তু-টস্তুকে পাত্তা দিইনি, কিন্তু সেদিন সত্যিই থরথর করে কাঁপছিলো আমার গা-হাত-পা। তা সত্ত্বেও হাঁটতে লাগলাম আমি, গির্জা পেরিয়ে এলাম, গীর্জার উঠোনে কাদের যেন পায়ের শব্দ শুনলাম, কিন্তু ঘণ্টার আওয়াজ ছিইয়ে আসতে লাগলো, ধীরে ধীরে আরো অস্পষ্ট হয়ে এলো আমার বাঁয়ে, ডানে আর পেছনে বাজতে থাকা যত ঘণ্টা। তারপর মুহূর্তে খুঁজুমণি, এভাবেই ফিরে এলাম বাড়ী, আর ভোর হতে-না-হতেই পোস্টম্যান খবর নিয়ে এলো—নিকোলাই-এর খবর, আমার ছোটোটি।"

ইভান্ আক্সানাসাইভিচ্ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে, আনা কনস্তান্তিনোভ্না আবার ভরে দেয় সেটা।

"আরেকটু চা নাও, ইভান, আলা ছুড়োবে এতে, চায়ের জলে যা শুকোয় জানো তো, এই নাও চিনি,—নাও, যত খুশী নাও। হ্যাঁ, এবার এদিককার কথা বলি, যে-বছর আমার ব্যাটাছুটোকে নিয়ে গেলো ওরা, সে বছর খুব ডাক পাড়ছিলো আমার মুরগীটা। ভোর হয়েছে কি হয়নি, অমনি শুরু হতো ডাক—সে কি ডাক রে বাবা—আমি আদেদিকে বললাম, 'যে তো ওর ঘাড়টা মটকে, তবে যদি ওর ডাক থামে, নইলে হতচ্ছাড়ী নির্ঘাত কোনো অমঙ্গল ডেকে আনবে বাড়ীতে।' আর সে-কথাই ফলে গেলো একেবারে দৈববাণীর মতো—চলে গেলো দুজনেই। আমার সোনার চাঁদ ছেলে দুটো—মেয়েটাকে নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করারও সময় পায়নি ওরা।"

অ্যাপ্রণের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে আনা কনস্তান্তিনোভ্না, ধান্ সাজিয়ে প্লেট এগিয়ে দেয় সামনে।

"খাও, ইভান্, খাও প্রাণ ভরে, একটু বাঁধাকপি চেখে দেখো না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, লড়াই তো শেষ হলো, তারপর আমার মেয়ে, সে ঠিক করলো দূরে গিয়ে থাকবে। কত করে বোঝালাম, করেই থাক না বেটী, অত দূরে গিয়ে কী করবি তুই ; কিন্তু না,—মেয়ে একেবারে নাছোড়। চলে গেলো সে, আর গিয়েই বিয়েটা সেরে ফেললো। প্রথমটায় ওর স্বামী বেশ সুখীই ছিলো, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাকাতে লাগলো এর ওর দিকে। আর তুমি তো জানই, বকনাকে যদি নতুন বাগানের ঘাস খাওয়াও তো সে আবার যাবে সেখানে। অতএব যা হবার তাই হলো, বিয়ের এক যুগ বছরের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেলো ওদের। আমার মেয়ে আবারো বিয়ে করেছে এখন, প্রথম বিয়ের ছুটো বাচ্চা আর এ বিয়ের ছুটো। সুখেই আছে ওরা এখন, যখন যা দরকার কিনছে, কিন্তু শরীরটা মোটে

ভালো যাচ্ছে না ওর। ওকে বললাম, বাড়ী এসে পাক্ কয়দিন, একটা গোরু আছে আমার, তোর যা যা দরকার সবই তো আছে, সবই তো তোর মা কী, থাকতে তোর অসুবিধেটা কোথায়—কিন্তু না, ও আসবে না···কী আর বলবো ইভান্ যা দিনকাল পড়েছে বন্ধুর বন্ধুর একবার করে পেট না খসালে চলে না ওদের। আগে তো এসব কেউ গায়েই মাখতো না, এখন এক দু মাস যেতে না যেতেই মাল খালাসের ধুম। এসবে কি কখনো শরীর ভালো থাকে, বল তো? আর তোমার—নাভিনাভনী অনেক নিশ্চয়ই।"

"আমারো ব্যাপারটা একই, আনা, ছুটি লুটতে এক পা বাড়িয়ে আছে সবসময়, কিন্তু ছেলেপুলে মানুষ করার কথা শোনাতে নারাজ। অতএব, গোড়াটাই উপড়ে ফেলো, তাহলে সব শান্তি;—একই ব্যাপার।"

"সেই কথাই তো বলছি, ইভান্, সেকালে এ সব নিয়ে মাথাই ঘামাতো না কেউ, বাচ্চাকাচ্চা হলো তো ভালো, না হলেও পরোয়া নেই। পঁচিশবছরের আগের বছর ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম, জানো। কিন্তু কিছুতেই টিকতে পারলাম না, গ্রামকার বাতাসে যেন ঘুম বন্ধ হয়ে আসে। ওরা বলতো অত বেশী চা খেয়ো না, কিন্তু চায়েতো কিছু হয়নি, তাছাড়া দুকাপের বেশী চা খেতামও না আমি। ছোটো নাতিটাকে কিছুদিন মনমাফিক করলাম, তারপর ওকে একটা নার্সারিতে ভর্তি করে দিয়ে ফিরে এলাম বাড়ী।"

আনা কনস্তান্তিনোভ্না বলে চলে, সঙ্গে সঙ্গে চা তৈরীতে শেষ করেছে ইভান আকানাসাইভিচ, আর সেও বলে চলে তার নিজের জীবনের কথা।

ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে অন্ধকার। চায়ের জন্য একটা সৌজন্যমূলক অভিবাদন জানিয়ে উঠে পড়ে ইভান্ আকানাসাইভিচ।

"বেশ, আনা, তাহলে এবার গোরুটাকে নিয়ে—"

"যাও গো, খোকাবাবু, ওকে নিয়ে যাও তুমি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঈস্টারের সময় ও বাছুর বিয়োবে, আর দুধও হবে খুব। তোমার গাইটাও তো বেশ ভালোই দেখছি, বেশ নধরকান্তি। তোমার যদি কিছু বলার না থাকে, তাহলে আর এ-ব্যাপারে কথা বলার দরকারই নেই।"

একটা জার্সি গাই টানতে টানতে বাইরে উঠোনে আসে আনা কনস্তান্তিনোভ্না, সঙ্গে ইভান্ আকানাসাইভিচ্। গাইটাকে এক নজর দেখে ইভান্, তারপর সাত-পাঁচ না ভেবেই ঠিক করে ফেলে ওকে বাড়ী নিয়ে যাবে।

"আনা কনস্তান্তিনোভ্না, মনে হয় আমার গাইটাকে নিয়ে তোমারো মনমত খুঁত করবে না। ওর বয়সটা কচি, আগে তিনবার বিইয়েছে, কিন্তু এবার কিছুতেই কিয়োনো গেলো না; দুদুবার ষাঁড়ের কাছে নিয়ে গেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।"

গোরুটাকে গোয়াল থেকে বের করে দরজাটা খোলে ইভান্ আকানাসাইভিচ, সিপারেট ধরা করে খানিক দূরটায় বেড় তাতে, আর আনা কনস্তান্তিনোভ্না গায়ে মাথায় হাত বুলোয় গোরুটার।

"ওর যত্ন নিয়ো, ইভান্।"

নাক ঝাড়ে দুদী, রুমালে, মাথার উপনিটার খুঁট দিয়ে মোছে চোখের জল, আর তাকায় চোখ পিটপিটিয়ে।

বদলি গাইটা নিয়ে বাইরে আসে ইভান্ আকানাসাইভিচ্।

"বেশ, তাহলে এখন আসি, আনা।"

"এসো, ইভান।"

বাইরে কী এক শান্তি, কী এক উষ্ণতা যেন বিছিয়ে রয়েছে, নরম এক অন্ধকার আলগোছে ছড়িয়ে পড়ছে

ছোট্টো গ্রামটার আনাচে কানাচে। বেদুর হয়ে আসা পথ ধরে ইভান আকোমোভাইচ্ হেঁটে চলেছে গাইটার পাশে পাশে, ছড়ির ডগা ধরে টান মেরে গাইটাকে তাড়া দিচ্ছে যাতে যাচ্ছে;—আর ভাবছে, ভাবছে কতকিছুই—জীবনের কথা, নিজের কথা, আনা কন্স্তান্তিনোভ্নার কথা, নিজের বউ আর সেই শহরে নাতনীর কথা, আর তার সেই প্রতিবেশী গাইলভের কথা।

বুড়ো মানুষের ভাববার মতো হাজারো জিনিস আছে এ-পৃথিবীতে, বিশেষতঃ যদি তার মনে পড়ে যায় যৌবনের দিনগুলি, মনে পড়ে পুরনো সেই দিনের কথা।

টীকা : কোলখজ্—অবিভক্ত সোভিয়েত দেশের যৌথ খামার

লেখক পরিচিতি—অবিভক্ত সোভিয়েত দেশের সত্তর-আশির দশকের এক বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিকেরনাম ভাসিলি বেলভ্। ১৯৬৭ তে "An Ordinary Affair" উপন্যাস লিখে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে সাহিত্য মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ঠিক যেমন তুর্গেনিভের "Hunters Sketches"-এর লেখকের অন্যস্থান ওরেল প্রদেশের বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শে মদির হয়ে ওঠে, বেলভের গল্পেও তার ভিটেমাটি তোলোগ্দা চেতনার শিকড়ে-শিকড়ে জড়িয়ে যায়। মূলতঃ গ্রামজীবনের গল্পকার বেলভ্—গ্রামের জীবন, তার স্মৃতি ও বিস্মৃতি, তার স্বপ্ন ও বাস্তব, তার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস—এ সবের ভেতর থেকেই এক নিপাট সাবলীলতায় বেড়ে ওঠে গল্প, প্রস্তাবনাহীন জীবনের নির্লিপ্ত কাহিনী। এ-ধারার বাকসিদ্ধ পুরুষ বাংলাভাষায় যাঁরা আছেন—ধরা যাক বিভূতিভূষণ কিংবা আশুতোষমুখোপাধ্যায়—তাঁদের রচনার পরিপূরক পাঠ হিসেবে বেলভের গল্প পড়া যেতে পারে এমনটাই অনুবাদকের বিশ্বাস। বর্তমান গল্পটি বেলভের "মর্নিং রঁদেভু" নামক গল্প-সংকলনে আছে।

With Best Compliments From :—

PURNA DISTRIBUTORS

A HOUSE OF DISTRIBUTION OF

PHARMACEUTICAL & CONSUMER PRODUCTS

Regd Off : 5/1, A. J. C. BOSE ROAD

CALCUTTA-70020

Phone : 240-4091

কৃতজ্ঞতা

কুশল সেনগুপ্ত

ভ্যাশ কেনহুর-এর গল্প হতে অনূদিত

অফিসের টেবিলে দেখলাম আমার নামে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। হাতের লেখাটা ছোট অক্ষরের, চেনা ঠেকল। এটা আমার দাদার লেখা। দীর্ঘদিন পর তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন। আমি কেন জানিনা ইদানিং বাড়ীতে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

আমার স্কুলজীবনে ব্যাপারটা নিয়মিত ধরাবাঁধা ছিল। আমি দূরবর্তী গ্রামের বাড়ীতে একটা লম্বচরে বাসে করে ফিরতাম। শহরের দীর্ঘ কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে আমি আমাদের গ্রামের জন্য ভীষণ টান অনুভব করতাম। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। আমিও বদলে গেছি। আমার মন এখন সব সময় একরাশ নাগরিক দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা, রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ। সময়ের অদৃশ্য গতির সাথে তাল মিলিয়ে কাজের চাপের নিত্য নৈমিত্তিক ধক্কায় আমি ক্রমাগত ভেসে চলেছি লক্ষ্য থেকে অলক্ষ্যে। গত পাঁচ বছর ধরে আমি কর্মসূত্রে দিল্লীতে আছি। অথচ বাড়ীর কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। আমার মা আমাকে অনেকবার তাঁকে চিঠি না লেখবার জন্য অভিযোগ করেছেন। তিনি আমাকে আমার বিবাহ পূর্ব জীবনের কথাও একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তবুও কর্মজীবনের এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তিতেই আমি মগ্ন থেকেছি। প্রমাণ করা যে আমি খুব ব্যস্ত সেটা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি এখন আর কোন অভিযোগ করেন না। সম্ভবতঃ তিনি মা বলেই আমার অসহায়তার কথা অনুভব করেন।

দাদা সাধারণতঃ আমাকে কখনও চিঠি লেখেন না। আমার কাছে তাঁর কোন দাবীই নেই। দাদা হওয়ার স্বাদে তিনি আমার কাছ থেকে কোনরকম আর্থিক সুবিধা কোনদিন চাননি। আমার ছাত্রজীবনে তিনি আমার ভালমন্দের খোঁজ-খবর করতেন। বাড়ী ফিরলে, পুকুর থেকে মাছ ধরে তিনি, বৌদিকে ভাল করে রাঁধতে বলতেন। যখন মাছ কম উঠত জালে, তিনি তখন বৌদিকে বলতেন—'ভাল করে তেলমশলা দিয়ে রাঁধো। ক্ষুধিত কতদিন পরে এসেছে।' এখনও তিনি ঠিক সেরকমই স্নেহপ্রবণ ও সিংহহৃদয়। কিছুই তাঁকে বদলাতে পারেনি। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে, বাবা-মা, গরু, বাছুর, চাষ-বাস, পারিবারিক দায়িত্ববোধ নিয়েও তিনি একইরকম আছেন। তিনি যে আমার দাদা।

আমি মন দিয়ে চিঠিটা পড়লাম। তিনি আমাকে দেশে ফিরতে লিখেছেন। সেখানে কিছু পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয়েছে। বৌদিদের মধ্যে কাজিয়া চলছে। আমাদের ধানক্ষেত, গ্রামের বাড়ি, সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভিনভাগ করা হবে। তাই আমার উপস্থিতি সেখানে এখন বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ মেজদা তাঁর ভাগ নিয়ে একটু বেশী দাবী করছেন। তিনি তাঁর দাবী যেকোনো মূল্যে পূরণ করতে আগ্রাসী। চিঠিটা পড়ে আমার

সারা শরীর ঘেমে উঠল। এক অজানা আশঙ্কা আমাকে ভয় করল।
ঠেলে সরাতে। চেয়ারে যথাসম্ভব হেলান দিয়ে কিম্ মেরে রইলাম।

সন্ধেবেলা আমার স্ত্রীকে যখন ঘটনাটা জানালাম তাকে অবিচলিত দেখলাম। সে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হচ্ছে?' যেন এই ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আমি সংক্ষেপে বললাম 'এক সপ্তাহের মধ্যেই।' রাতে বিছানায় শুয়ে সে আমাকে নানা প্রশ্ন করল। আমাদের ভাগে কি কি পড়বে, এবং সে জন্য কিস্তি করে কত টাকা পাওয়া যাবে ইত্যাদি। আমি চুপ করে ছিলাম। শুধু তাকে খুশি করতে বললাম, তা লাখ খানেক টাকা তো বটেই। সে আমার কাছে ঘেঁসে বলল, 'গ্রামের জমি আমাদের চাই না। ওসব আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। আমরা ওটা বিক্রী করে টাকা নিয়ে নেব। মনে রেখো পুরো টাকাটা আমার হাতে দেবে। আমি জানি ঠিকভাবে তা খরচ করার রাস্তা। তোমার একটা স্যুটের দরকার। আমাদের দরকার একটা সি. ডি. চিড়ি। বাকীটা ব্যাঙ্কে থাকবে। ঐ জমি আমরা দেখাশোনা করতেই পারব না, ওসব রেখে কি লাভ? আমি অন্ধকারে চেয়ে থাকা নিরীহ মেষশাবকের মত সমস্ত শুনছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন কথাই তার ছুরিতে ধার দিয়ে বলতে চাইছে যে মৃত্যুর পরে খুব সুন্দর জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেসব দিন, সেসব অনুভূতি কি তাহলে ফসিল হয়ে গেল, যখন 'বাড়ি' এই মধুর আকর্ষণ আমাকে শিহরিত করে তুলত আনন্দে। আর 'মা-দা' ডাকটা। কি অনির্বচনীয় কোমল ডাক। আমাকে কত আনন্দে ভরিয়ে তুলতো। এ সমস্ত মনে হতে আমার নিজেকে বড্ড অসহায়, বড্ড দুর্বল বলে মনে হতে লাগল। সেই সব আনন্দময়ী দিনগুলো কোথায় গেল? আমার সেই ছবিটাও কি বদলে গেছে? সেই মাতৃত্বও তাই বা কোথায়? আমার স্ত্রী এসবের কি বুঝবে?

যাই হোক, রবিবার বিকেলে দিল্লী থেকে হাওড়া হয়ে আমি বাঁকুড়া নেমে আমাদের গ্রামের দিকে রওনা হলাম। সেই একই লড়ঝরে যাত্রাবোঝাই বাস। বাসের ছাদে, লোকজনের মাথে মুরগী, ছাগল বোঝাই হয়ে আছে। পুরনো স্মৃতির রোমন্থন। ড্রাইভারের ঠিক পেছনে আমার প্রিয় সিটে আমি তাড়াহুড়ো করে বসতে গেলাম। ধরজায় হাঁটু ঠুকে আমার সুটকেসটা খুলে পড়ে গেল। দিল্লী থেকে মায়ের জন্য নিয়ে আসা কালিবাড়ির প্রসাদ সমস্ত মাটিতে ছিটকে পড়ল। আমার মনে হল বাসশুদ্ধ সকলে আমাকে বিদ্রূপ করে বলতে চাইছে—কত বছর পর তোমার দেশের কথা মনে পড়ল, সুমিত? ভালবাসা বিক্রী করে রাজধানীর দামের মনে গেছো। ছিঃ! আমি সিটে আমার ঠিকভাবে বসে সুটকেসটা গুছিয়ে কন্ডাক্টারের দিকে চেয়ে ম্লানভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম।

সন্ধেবেলা গ্রামে পৌঁছলাম। আমি আগেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম, দাদা ঠিক আগের মতই বাসস্টপে অপেক্ষা করছিলেন। ওঁকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল: 'সুটকেসটা আমার হাতে দাও, ওটা নিশ্চয়ই ভারী'—এই বলে তিনি আমার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিলেন। আমি ওঁকে প্রণাম করতে ভুলে গেছি। যেটা আগে কখনও ঘটেনি। তিনি আমার সামনে হাঁটছিলেন, আমরা গ্রামের মেঠো পথে পড়লাম। একইরকম চারিদিকের পরিস্থিতি। ঘুলোমাখা পথ। আমার শৈশবের কথা মনে পড়ছিল।

আমি এই রাস্তা দিয়েই মাষ্টারমশাইর কাছে পড়তে যেতাম। বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যেত। চারপাশে তখন

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দাদা প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যেতে আসতেন যাতে আমি ভয় না পাই। তিনি হাতে লণ্ঠন নিয়ে, তাঁর কাঁধে আমার ব্যাগটা ঝুলে নিয়ে আমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে যেতেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম। পেছিয়ে পড়লে তিনি ঠিক বলতেন, 'তুমি হারিয়ে গেছো, এস আমার হাতটা ধরো'। কখনও কখনও তিনি আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আলপথে বিকেলে বেড়াতেন।

বাস স্টপ থেকে বাড়ি কিছুটা দূরে। আমি পেছিয়ে পড়ছিলাম তিনি থেকে থেকে ঠিক ভোটবেলার মত প্রশ্ন করছিলেন 'হারিয়ে যাচ্ছো?' আমি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। অতীতের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছিল শৈশব আর এখন, কত পার্থক্য! সময় বদলালেও দাদা একটুও বদলাননি। তখনকার মতই তিনি এখনও আমার পথপ্রদর্শক। আমার নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল।

আমি কিছুটা দ্বিধার সাথেই বললাম, "দাদা, সুটকেসটা আমার বইতে দিন।" "তুমি কিছু চিন্তা কর না, এটা বেশ ভারী, তাছাড়া তুমি ক্লান্ত। চল, তাড়াতাড়ি হাঁটি। তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। রাতের খাবার সময় হয়ে গেছে।" আমি নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আমরা বাড়িতে পৌঁছলাম, অনেকক্ষণ সন্ধে হয়ে গেছে। তুলসীতলায় সন্ধে দেওয়ার সময় অতিক্রান্ত। আগের মত ভাইপোরা কেউ দৌড়ে এল না, বৌদিরাও কেউ এগিয়ে এল না। চারদিকে নিস্তব্ধ। শুধু আমার মা এগিয়ে এলেন ও সামনে এসে দাঁড়ালেন, সমস্ত বাড়িতে অস্বস্তিকর অবস্থা, চারপাশের নিস্তব্ধতা, যেন শুধু বাড়িটা চুকরো হওয়ার অপেক্ষা। বাড়ির সামনের উঠোনে সমস্ত জিনিসপত্র জড়ো করা হয়েছে। তাদের তিনভাগ করা হল। কিছুই বাদ যায়নি। দাদা একপ্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর হাতঘড়িটা জিনিসপত্রের মধ্যে রাখলেন। তাঁর চোখে জল চিক্‌চিক্ করতে দেখলাম।

এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

আমার বেশ মনে আছে যে বাবা তাকে এগারো ক্লাসে পড়বার সময় হাতঘড়িটা দিয়েছিলেন। দিল্লীতে আমার ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় তিনি সেটা বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি আমাকে এভাবে তিনশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। কেউ জানত না সেটা ছাড়ানো হয়েছে কিনা। তিনি সেটা উঠোনে জড়ো করা জিনিসপত্রের মধ্যে রেখে অতীতের সমস্ত বন্ধন যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেন।

আমার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোচ্ছিল না। বড়বৌদি আমার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। মেজদা, মেজবৌদির কানে নীচুস্বরে কিসব ফিস্‌ফিস্ করছিলেন। দাদা নির্বাক দর্শকের মতই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করছিলেন নিরাসক্তভাবে। তাঁকে ঠিক এরকমভাবেই নিরাসক্ত থাকতে দেখেছি আমার বিয়ের সময় ও তাঁরই বড় ছেলের বিয়ের সময়। ঠিক একই রকম গাম্ভীর্যের সাথেই তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেই যেন দাঁড়িয়ে আছেন। মেজদার সাথে ছোটখাট আলোচনাতেও তাঁর এই শান্ত, গম্ভীর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল না। কোন রকম বিবাদ বা বাধা-

ঘাবড়াবার লেশমাত্র তাঁর চোখেমুখে দেখছিলাম না। আমার মনে আছে, বাবা যখন মারা যান, তখন আমাদের তীব্র আর্থিক অনটন চলছিল। তখন শীতকাল। আমাদের মাত্র দু-তিনটে কম্বল তখন সম্বল। ঠাণ্ডা এমনই কাঁপিয়ে বসেছিল, বিশেষতঃ মাঝরাতে যে একটা কম্বলও একজনের জন্য যথেষ্ট বলে বোধ হত না।

এক রাতে আমি আমাদের ছুটো ঘরের মাঝখানের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি দাদার কম্বলটা আমার গায়ে চাপা দেওয়া। খুব ভোরে তিনি মাঠে চলে গেছেন কোন গরম জামা কাপড় ছাড়াই। আমি নিশ্চিত, যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, তাঁর ঠাণ্ডা লাগে না। আমার এখন যথেষ্ট রোজগার। তবুও একবারের জন্যও মনে আসেনি দাদাকে একটা গরম পোশাক উপহার দেওয়ার কথা। তিনি এখনও সেই একই ছেঁড়া কম্বল নিয়েই সন্তুষ্ট। জড়ো করা জিনিসপত্রের মধ্যে সেটাকেও আমি লক্ষ্য করলাম।

আমি আমার কৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। পারিবারিক তাজনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। মেজদা যা যা দাবী করেছেন দাদা সবই হাসিমুখে মেনে নিলেন। মেজদা আমার অংশের জমিটাও কিনে নিতে চাইলেন।

সন্ধেবেলা দাদা আমাকে আমাদের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে আমার নিজের অংশটুকু দেখালেন। আমি নিঃশব্দে সমস্ত দেখলাম। তিনি চারদিকের পরিসীমা কতটা তা আমাকে বোঝালেন। সর্বত্র আমি তাঁর পদচারণ, হাতের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। দাদার ঘর্মাক্ত শ্রমের চিহ্ন উপলব্ধি করছিলাম চারদিকেই। বাবা যেভাবে নতুন অতিথিকে সংসারের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন ঠিক সেভাবেই তিনি আমাকে সমস্ত দেখাচ্ছিলেন।

ভোরবেলা আমাকে কলকাতার ট্রেন ধরতে বালসটপে যেতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, দাদার সাথে দেখা করার সৎসাহসটুকুও আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বালসটপে যাওয়ার আগে তাই আমার অংশের প্রদানীসূচক স্লিপ আমি বৌদির হাতে ধরিয়ে দিলাম, আমি বৌদিকে সেটা দিয়ে দাদাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে দিতে বললাম। তারপর চুপচাপ আমি বাড়ি থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলাম।

দাদাকে দেওয়ার জন্য ঐ স্লিপটাতে আমি লিখেছিলাম, "দাদা ঐ জমির অংশ নিয়ে আমি আর কি করব? তুমিই আমার সেই জমি যাতে আমি জীবনের সমস্ত ফসল ফলিয়েছি, অথচ তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমার আর কিছুই নেই। আমি তোমাকে এটা দিলাম। তুমি এটা যদি গ্রহণ না কর তাহলে আমি আর কোনদিন তোমাকে আমার মুখ দেখাব না।"

সারা জীবনে দাদার প্রতি এই একটাই মাত্র কৃতজ্ঞতা আমি দেখাতে সক্ষম হয়েছি। বিবেকের দংশন হতে আমি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত।

উর্দু কবিতা

ইকবাল থেকে

শঙ্খ ঘোষ

ছেয়েছে আকাশ ওই কোজো হাওয়া ওই নিশিকালো মেঘে
তড়িতেরও যেন অলুপ হারাল সে-ঘন তামসে লেগে ;
শূন্যে ঝুলছে মহাপারাবার
ছেঁড়া আঁচলের ঘুরোয় তার
বুক ভরে যায়, তীর অদৃশ্য, ঢেউ ছুটে যায় বেগে
উদ্যত, তবু গাঙচিল সঙ্গে যুঝে পারে না রেগে।
কবি আর আমি সে-কালো সাগরে
প্রেতের মতন আছি মনোযোরে—
তিনি ঘুরেছেন বহুদেশ, আমি নতুন প্রাণায়াম
দূরকে দেখার আশায় আমার ঘুচোখে অধীর টান।
অবিরাম কেঁদে জানাই 'আমার দৃষ্টি বস্তুসারী—
কোথায় যে সেই আরেক জগৎ দেখতে পাই না আমি।'
হঠাৎ জাগল পাহাড় বিরাট
নদী আর এত প্রসারিত মাঠ
গিরি-সমতলে শত বসন্ত অঙ্গেবে যেন ধরা
গিরিচূড়া থেকে বইছে বাতাস কস্তুরীবাসে ভরা।
পাখিরা গোপন গুঞ্জনে রত
সন্ধের শুভ্র আযোজাগ্রত
উঠছে ফোয়ারা, বাতাসপ্রবাহে শরীর নিজে ছিন্ন
স্বপ্নোন্মুখ শুভ্র চেতনা জাগছে শরীরতীরে।

মহম্মদ নজরুল ইসলামের কবিতা

অনুবাদ : অরুণ কুমার চক্রবর্তী

(মানবহৃদয়ের অন্যতম কবি। উর্দু কবিতার গাম্ভীর্য ও বনেদীয়ানা ভেঙে একেবারে আধুনিক হয়ে ওঠা খুব সহজ ব্যাপার নয়। নজরুল তা পেরেছেন। ওঁর কাব্য জগতের চলাচল চরম রোমান্টিকতা থেকে কঠিন বাস্তবের একেবারে মাঝখানে, সেখানে মিশিক হয়েছে বিশ্ব-মানবতা। মানুষ, রাজনীতি, প্রকৃতির বৈচিত্রময় ইতিহাস আর ঘুমপড়ানি।)

ইস্রাফিলের শিঙা

কেউ কি জানে কাল কি যে হবে
কে যে থেকে যাবে, কে যে লাশ হবে

সবাই বলছে বিশ্বে শান্তি চাই
অথচ শস্ত্র-ভাঁড়ার বাড়িয়ে যাই
অন্যের কথা ভাবার সময় নেই
হায়, আপনি মশগুল আপনাতেই

দুইটি যুদ্ধ তো হয়েছে শেষ
তৃতীয় কি আসন্ন, সবিশেষ ?
তার আগেই যদি শিঙা ফোঁকে ব্যাটা ইস্রাফিল
পৃথিবীর তাগো কি যে হবে, ভেবে মরি আকুল !

স্বপ্নের উঠোন

যতদিন আমি চিনি, তোমাকেই চিনি,
স্বপ্ন-উঠোনে ঘুরেছো ফিরেছো
আমি তোমাকেই চিনি ;
যখন দেখিনি, ঘাসের পাতায় শিশির বিছানে চিনি
দুঁড়ি ও কাঁটায় চেউয়ের মাথায়
মাঝ গঙ্গায় কিংবা কিনারে, চিনি
চাঁদে বা আকাশে তারাদের পাশে
জোছনার তীরে অমরতায় চিনি , তোমাকেই চিনি
চলকেই-ওঠা যমের সেলামে
ঔটিখানা তার অলসে—লালসে
মনের আকাশে পূজা-অবকাশে হৃদয়ের চোখে চিনি
আমি যে তোমাকে চিনি।

আত্মা ও মৃতদেহ

হে আমার মৃত্যুর মালিক, একটু সবুর করো,
দেখো—কেমন প্রাণহীন শুয়ে আছি। আর ওদের দেখো
যারা আমার চার পাশে বসে কাঁদছে। একটু আগেও
আমার নোংরা শরীর থেকে দুর্গন্ধ উঠছিল, কেউ আমাকে
চান করিয়ে দেয়নি আর এখন, দেখো, কেমন আমার
সর্বাঙ্গ ঘুরে দিচ্ছে। নানান রঙের চাঁদর এলো, আতর এলো,
গোলাপজল এলো,—অথচ একটু আগেও এক টুকরো
কাপড়ের জন্যে হা-পিত্তোশ্ করে বসেছিলুম। এখন,
আমার গায়ে চাদর চড়ানোর জন্যে কেমন হুড়োহুড়ি
প'ড়ে গেছে। এরপর মিছিল হবে; শোকসভা হবে, বাঃ।
যখন বেঁচে ছিলুম তখন যা পাইনি—এমন ঘটা
সহজেই সব পেয়ে যাচ্ছি—তুমি দেখো, তুমি দেখছো তো?

কখনও কখনও

কখনও কখনও জল খুঁজি সাহারায়
কখনও কখনও ফুল খুঁজি কাঁটাবনে
যেহাল শরীর শুশ্রূষের প্রয়োজনে
কখনও কখনও ঘুরেছি তাঁতিখানায়
ছবি-আঁকিয়ে রঙে-ক্যানভাসে তুলিতেই
কিংবা কবির কোনো কবিতায় ঝুলিতেই
ক্ষুধার্ত মুখ খুঁজতে গিয়েছি কখনও
জীবনের মানে খুঁজতে কখনও কখনও
জীবন খুঁজেছি নির্জন হিম মাজারেই
পথ আছে, রয়েছে পথ-দেখানোর লোকও
তবু পিছলেই পড়ি হঠাৎ কখনও কখনও।

ওড়িয়া কবিতা

ডঃ প্রসন্ন পাটশানি

অনুবাদ ঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী

(ফুটবার ল্যাণ্ড থেকে ডি. এস. সি এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডঃ প্রসন্ন উড়িষ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মানসিক চেতনায় একজন যোগী। ভারতের বৈদিক চেতনায় তাঁর জীবনযাপন। রচিত বইয়ের সংখ্যা ৬৫। উড়িয়া ভাষায় ৩১। ইংরাজী ভাষায় ৯।)

প্রভু, তুমি কি মানুষ

প্রভু, তোমার জন্যে, শুধু তোমারই জন্যে
আমার সব রক্ত ঘাম ক'রে ঝরিয়ে ফেলছি
আমার পোড়া চোখে ঘুম নেই
আমার সব ঘুম তোমার দুচোখে মাখিয়ে দিয়েছি
তবুও আমার বৎ-সামান্য খাবারের কণায় কণায়
তোমার রাজপাখির চোখ,
দুটো বেলায় আমার যে দুখানা রুটিও জোটে না
প্রভু, তুমি জানো, এই দুটো হাত তোমাকে
রোজ রোজ সেলাম ঠোকে,
আর তুমি এও জেনে রাখো—
আমার এই দুটো হাত
ছুরি ধরতেও জানে!

প্রেমিকা

আমার জন্যে এতো চোখের জল ফেলছো, কেন,
তুমি তো জানো, আমি এক অন্ধ পথের পথিক ;
আমার সমস্ত পথ কাঁটায় কাঁটায় ভরা
সেই কাঁটাগুলিতে তুমি প্রেমপিরিতি খুঁজতে চাইছো?
আমার চেতনায় যে আগুন অবিরাম জ্বলছে
তোমার চোখের জল তাকে কি নিভিয়ে দিতে পারে?
তবে, হে আমার প্রিয় নারী, এসো—
চালো, চালো তোমার সবটা চোখের জল আমার আগুনে!
আমি বিরহের নদীতে সাঁতার কাটছি
যদি পারো, চলে এসো, পড়ে থাক সব পিছুটান,,
ছিঁড়ে ফেলো,
আমি তুমি, তুমি আমি একসঙ্গে সাঁতার কাটবো।

অসমীয়া কবিতা

সমীর তাঁতীর কবিতা

অনুবাদ ঃ কবি স্বয়ং

শতুর দশকের শেষে লিখতে শুরু ক'রে এই তরুণ কবি এখন অসমীয়া কাব্য জগতের এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৭৯ সালে 'মানবিক' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থের নাম 'ঘুড়ঘুড়ির কবিতা' ও 'শোকাকুল উপত্যকা'। এই কবিতাগুলি কবি নিজেই অসমীয়া থেকে অনুবাদ করেছেন।)

গতকাল নরক থেকে

ঘোড়ায় চেপে আসেনি এসেছিল অন্ধ কাপালিকের ছদ্মবেশে
নগ্ন পায়ে একা রাতের শেষে যত্রা যেমন আসে আর নাচে
ওম্ বলে ডাকে ডাকিনী মন্ত্র ডাকে মাটির বুক ফেটে
যা কিছু বেরিয়েছিল চট করে চেটে নিয়েছিল।
আকাশ নামের লাংড়া কুকুর আর নেংরা বাতাস শিসের শব্দ কানে
প্রতি মাসে এই শকুনের বেশে বস্ত্রবিরোধী শিশুরা
অভ্যাস করে আঙুলের ডগায় পণ্ডিত জ্যোতিষী নয় ওরা
বন্ধ্যা অন্ধ ছাটাই পতিতার মাংস ক্ষুধা
বক্তৃতার ফুলঝি ধান্ধার গোড়া ছাই গত্যার কিন্তু নেগেটিভ
ক্যাপসনের ভগব করা তিথিরির ছোট মিছিল
সম্প্রীতি প্লেগ সম্প্রীতি

গরুর বলে শেখেনি শিখেছিল নগ্ন সাকালের আস্ফালনে
জ্বলন্ত যেমন চিতা অন্ধকারে করে শিকার তেমনিভাবে
কালো রক্ত মেখে সাদা করোটি হাতে

তোমার যা ইচ্ছে করো

আমি অপরাধ করেছি অপরাধী তোমার যা ইচ্ছে করো

আমার রাস্তা, তুমি চেনো কোন গলির কোন মোড়ে কতকাল
দাঁড়িয়ে আছে ওরবাড়ি বেসরকারি

তাকে ডাকো
তোমার যা ইচ্ছে করো

কেউ কি শখ করে মায়ের কোলে শেখে প্রাচীন অপরাধের পাঠ
কালি-কলম নিয়ে কখনো ফিরি করে কেউ
তোমার শহরে একবার লজ্জা বেচে বেঁচে থাকার পর
কেউ তাউকে কখনো অসহায় করেনি

শিশুদের জন্য শুধু শিশুদের জন্য
একটু ভাবো
যেদিক থেকে পারো পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
যেকোনো জায়গায় হিসেব করে রাখো কিছু খড়-কুটো কিছু সবুজ

উঠান
নইলে মূর্তির ওজনেট

আমার পোস্টার তুমি চেনো কোন পরীর কত মাসের কতকাল
টেনে যাচ্ছে রেলগাড়ি বেসরকারি

তাকে ডাকো
তোমার যা ইচ্ছে করো

আমি অপরাধ করেছি অপরাধী

সেই যে চলে গেলে তুমি

সেই যে চলে গেলে তুমি
তখন থেকেই ভুলে গেছি সবকিছু

কোথায় যেন কী ঘটেছিল
পাতা ঝরেছিল, মেঘ জমেছিল

তারপরও
ভেতর থেকে হাহাকার করে শরীর

জানালাগুলো খোলা থাকার পরও
কখনো চোখে পড়েনি চোখ

কেউ কি কবুল করেছিল
ওপার থেকে সন্ধ্যা এসে ফিরে আসার কথা

এ তো ছায়া নয়
আকাশ থেকে খসে-পড়া ছায়ার ব্যাকুলতা

তবু একটি চুমু রেখে যাবে তারাগুলো
সত্যি কাউকে ভুল করিনি আমি

ক্ষমা করো
বলে ক'য়ে ক্ষমা করো তাকে

পথে আসার পরও
আমার মনে পড়ে

সেই ঝিকিমিকি মেয়েটির মুখ থেকে ঝুলে-থেকা
টাদের আলো।

দাহন করো পৃথিবী

তোমার বিষাদের চুম্বনে দাহন করো পৃথিবী, দাহন করো আপেল
নীল শিশলের রোদ উজাড় ক'রে দাহন করো আমায়

এই যে নরম শরীর অরণ্যের ভালোবাসা এখানে লেগে আছে পাপের ছায়া
মাটির গন্ধে মেয়ের উরসে তাকে কালো সোনা
বেশ্যা না তার কাছে যৌবনের ঋতু
অনেকবার পোড়ার পরেও মেটেনি সেই তৃষ্ণা
কামনার উৎসবে
দাহন করো তাকে
তোমার হাতের মুদ্রায় গ্রহণ করো তার শিখা
যদি পারো দিও আদর, কল্পনার উজ্জ্বলতা

বিশ্বাস করো আমি খাইনি তোমার আপেল
আমার বংশের লোকজন কেউ খেতে পারেনি আপেল
সে তো সেই কবেকার কথা, জল ছিল, বাতাস ছিল, আবাদ ছিল সবকিছু
লালের ইচ্ছের ঈশ্বরের রূপসী নারী দিয়েছিল তার আপেল
ঠোঁটের মধু, জিভের লালসা দুই চোখে মেখে
ঈশ্বরের দাম এক পুরুষের হাতে
বিশ্বাস করো আমি কোনো ঈশ্বরের অনুচর নই

আমি পুরনো, আমার স্বপ্নের জামাটাও পুরনো
আমার ক্ষুধা আর নিঃসঙ্গতা বর্বার চেয়েও
পুরনো, জিজ্ঞাসা কোরো না আমার…

তোমার বিষাদের চুম্বনে দাহন করো পৃথিবী, দাহন করো আপেল
নীল শিশলের রোদ উজাড় করে দাহন করো আমায়

তেলেগু কবিতা

যোশুয়ার কবিতা

অনুবাদ : সোমক দাস

[শ্রীশ্রীরাম যোশুয়া (১৮৯৫-১৯৭১) তেলেগু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত যিনি তাঁর কবিতার প্রতিবাদের বলিষ্ঠ স্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতার বিরুদ্ধে। তাঁর বাণী ছিল—সব মানুষই সমান। যোশুয়া ছিলেন স্কুলশিক্ষক, নীরব চলচ্চিত্র ও নাটকের ডাক্তকার, যুদ্ধবিরোধী, দেশপ্রেমিক, সর্বভারতীয় বেতারের প্রযোজক, বিধানসভার সভ্য (অন্ধ্রপ্রদেশের), গুন্টুর পৌরসভার 'স্বাধীন নাগরিক' পুরস্কার প্রাপ্ত, একাধিক সাহিত্য-পুরস্কারে ভূষিত—যার মধ্যে উচ্চতম হল অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাপ্রপূর্ণা (১৯৬৯), ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (১৯৭০) ; "কিস্ট্ চরিত" গ্রন্থের জন্য কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরাম যোশুয়া কবিতায় প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যোশুয়ার কবিতার গভীরে নিহিত আছে মানবিকতাবাদ। নানান বিরুদ্ধতার সঙ্গে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন এবং নিজেকে একজন প্রথম সারির কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুদ্ধ, ঘৃণা ও সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে তাঁর কবিতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তাঁর বিদ্রোহের শক্তি ঘৃণা ও হিংসাত্মক মেশানো ছিল। মধুর প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রচার করেছেন তিনি আজীবন। দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি মিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল সহানুভূতি ও সমবেদনার সাহায্যে পাঠকের হৃদয়কে তিক্ততা ও অসততা থেকে পরিশুদ্ধ করা।

যোশুয়ার শ্রেষ্ঠ কীর্তি "ভিরবৌলি" (১৯৩২) চূড়ান্ত কাব্যিক দক্ষতা ও কুশলতার পরিচায়ক। "পাবিলাম" (১৯৪১) বা বাদুড়—কবির জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের জাতপাতের বিভেদ ও দারিদ্র নাছনার প্রতিবেদন। চিরন্তন মানবতাবাদের শক্তি তাঁর কাব্যে প্রতিভাত। তাঁর কবিতা একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত ; সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথায় আচ্ছন্ন মানুষের হৃদয়কে পুনর্গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও মানবিক করে তোলার লক্ষ্যে নিয়োজিত। নিজের সময়ে তিনি মহত্তম মানবতাবাদী কবি হিসেবে পরিগণিত হবার উপযুক্ত।]

বাদুড়

…আমার স্বজাতিরা শিক্ষা অর্জনে গর্ব করে খুব
উড়ে উঠতে পারে না তবুও অন্যুচ্চদের হিংসা থেকে !
ঘৃণায় নিয়ে বাঁচতে শেখে না—
এসব তুচ্ছ অর্থে পূর্ণ ধর্ম নিয়ে আর কি কাজ মানুষের
সমাধা হবে ?

তাদের নিজেদের রক্তের সঙ্গে আরও অপমান ছুড়ে
স্বজাতিরা আমার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে

মারামারি করে নিজেরা
জাতপাতের বলি তো সবাই, তবুও নিজেরাই
উঁচু জাত আর নিচু জাত
এই ধারণার শিকার হয় নিজেদেরই মধ্যে
অস্পৃশ্যতার মহান প্রতিভূ, স্বয়ং গান্ধীও
বুঝতে পারেননি এ পরিহাস।

এসব নিষ্পাপ লোকেরা কবিদের সমর্থনা দেয় খুব
লেখে যারা সব যুদ্ধের গান, শান্তি কিংবা বেহ
সুযোগ্য কোনো কবি কি কখনো অন্যায়ে
মুক্তি দিতে এই হতাশা থেকে ?

ধর্মনেতারা সার্থক সব অভিনেতাদের মত
পরিবর্তিত কালের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়
তাদের শাসন দরিদ্রদের উপহার দেয় অকথ্য লাঞ্ছনা
হাসবার বদলে একটি মিথ্যা অর্জন করে সত্যতা।

কর্ণ হয়তো নিঃশেষ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে
কিন্তু তার গৌরব থাকে সর্বত্রই উজ্জ্বল
ঈর্ষা ও ঘৃণা একটি কবিকে কিছুকাল হয়তো বা
অবদমিত করে রাখতে পারে
কিন্তু যে তার কাব্যপ্রতিভা একদিন ফুটে বেরোবেই।

অর্জুন জয় লাভ করেছিল কৃষ্ণের আনুকূল্যে
কিন্তু সে তো আশ্রিতকে রক্ষা করার দায় ;
প্রকৃত সত্য সকলেই তো জানে
সমর যুদ্ধে কর্ণকে কখনো
হারাতে তো আর পারতো না অর্জুন।

এসব ধর্মপুস্তকগুলি তাড়া করে ফেরে আমাকে
ঘিরে ধরে থাকে তাবৎ ইচ্ছার বিপরীতে
নিরন্ধ্র সব লক্ষ্যভাকে দমন করতে তারা বর্ষণ করে
প্রাণনাশক ঔষধ
কিন্তু, ওগো বান্ধব—তুমি জেনো, তোমারই প্রশিক্ষণে
ধুয়ে মুছে যাবে যাবতীয় ওই ধর্মগ্রন্থ-প্রভাব।

এমন দেশ কি আছে কোথাও যেখানে
ধর্মীয় উপাসকেরা সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় ?
এমন দেশ কি আছে কোথাও যেখানে শান্তি এবং সামঞ্জস্য
আতপাতের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ?
এমন দেশ কি আছে কোথাও যেখানে একটি মানুষ অন্যকে
অভিযুক্ত করে অস্পৃশ্য বলে ?
কিন্তু এখানে এই বঙ্গল পৃথিবীতে
যেখ আমি শুধু অপচয় করি যাবতীয় উৎসাহ
গ্রাম্য দেবদেবীর সামনে নৃত্যগীত করে আর মাদল বাজিয়ে
সেসব মানুষদের আনন্দ দিতে
চালু রাখে যারা এসব প্রথার ধারা।

এসব শিক্ষিত এবং পঠ লোকেরাই
ছিনিয়ে নিয়েছে আমার অধিকার যুগ যুগান্ত ধরে।

গ্রাম থেকে তারা তাড়িয়ে এনেছে আমাকে
এখন তারাই বন্য মেয়ার ভাব দেখায়
তাদের দান অন্তঃসুরের মত
ভাইদের জন্যে যা বানিয়েছিল কৌরবেরা।

কবিরা তাদের নিয়ে গল্প রচে দিয়ে
তবুও পায় না খ্যাতি
সমালোচকের অসঙ্গত মন্তব্যের কারণে
হিংসুটে জিভ সত্য বলতে পারে না।

শিক্ষার উপযোগিতা কি
বিজ্ঞানী সব ধর্মীয় আচার যদি না সে বিনষ্ট করতে পারে ;
শিক্ষা কি তবে সংস্কারের বাঘের ভোগ হবে ?
ছন্ন প্রচার সংরক্ষণ করবে শুধুই ?
মানবতার জন্ম দিতে না পারলে
শিক্ষার আর তাৎপর্য কি ?

চিরস্থায়ী শান্তি কি তবে সম্ভব হবে কখনো
মানবজাতি যদি বিভিন্ন হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রজাতিতে পর্যবসিত ?

চিরস্থায়ী শান্তি কি তবে সম্ভব হবে কখনো
মানবজাতি যদি বিভিন্ন হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রজাতি ও ধর্মে ?
স্বাধীনতার যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম লড়তে পারে কি একসাথে ?
উত্তর ও দক্ষিণের হস্তীরা সব বাঁচতে কি পারে একসাথে ?

পুরোহিতদের ভবিষ্যৎ-বাণী
অন্যায় আর অবিচারের প্রতিরোধ করতে জন্ম নেবে
ঈশ্বর বসন্তরায়
এই জাল পুরোহিতরাই
যাবতীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির মূল কারণ।

কোন উদার দেবতা আমাকে এ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এনেছে
চিরকালের জন্যে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতে ?
প্রতিদিন রুটির জন্যে আমি যখন যুদ্ধ করি
অসংখ্য ঈশ্বর কাঁপ দিয়ে প'ড়ে গিলে খেতে চায় আমার রক্ত মাংস

এই ভাবে সে যত বলে যায় প্রাণ নিঙড়ানো গল্প তার
বাদুড় করায় সহানুভূতির অশ্রু
উড়ে চলে যায় ঈশ্বরের আবাসের দিকে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে পূর্বের আকাশে।

সে হতভাগা অস্পৃশ্য তার শেষ রক্তবিন্দুটিও ব্যয় করে
অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ঈশ্বরকে জানাতে
এই পবিত্র পক্ষীর মাধ্যমে
ঈশ্বরের প্রত্যুত্তর পেতে।

এই শ্রমে সে কি পতিত হবে মৃত্যুমুখে ?
নাকি
স্বাধীনতার ফসল ফলাতে সক্ষম হবে অবশেষে ?

.....(অংশ)

মারাঠি কবিতা

পুরুষোত্তম-শিবরাম-রেগে

অনুবাদ : শীশবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে মারাঠি আধুনিক কবিতার অঙ্গনে অন্যতম প্রধান কবি। তিনি চাঁদ নামে এক প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক কাগজ সম্পাদনা করেন। তিনি মারাঠি ভাষায় বহু কবিতা ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি অবসরের আগে অবধি Elphinstone College-এর প্রধানাচার্য ছিলেন।

ভগবান হাজার-আঁখি

লজ্জায়, সংকোচে বা যে কোন কারণে
মননে আসে সবার সামনেই তুমি মুখ ফেরাও।
অথচ দুই মানব, তোমার প্রতিটি ধর্ষণে সিক্ত হই…
হাজার-আঁখি যে তোমার…আর পাতক আমি জানছি, পুড়ছি দহনে।

মালয়ালাম কবিতা

আল্লা পামিজর

অনুবাদ : তথাগত মৌলিক

[মালয়ালাম কবি আল্লা পামিজর কেরালা ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কবিতাটি কবির ইংরাজী 'ইচ্' কবিতার ভাবান্তর।]

যে রহস্য বেদনায়

সেই বেদনাটা প্রথম
যারা বাঁধল আমারে তার হাটুতে
পেখমারের মত আগ্রহ নিল বাঁধে
হে বন্ধু, আমরা কি শুশ্রূষা দিতে পারি না
দিতে পারি না কোনও শক্তির বিশ্বাস ?

তারা বলেছিল এই পৃথিবীর জন্ম
ঘর্ষণীয় বেদনার মধ্যে
অন্যেরা বলল ঈশ্বর বিনাশ্রুত
জন্ম বেদনায়
এ সবই জানা ছিল—
আঁচড়ে নেবার শক্তি
আর সব মীমাংসার—
অনন্ত সত্য।

সাঁওতালী লোক গান সরহায়

অনুবাদ : মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

[সাঁওতালী লোক গানে জীবন যন্ত্রণার ছবি পরিস্ফুট। কোন কোন সঙ্গীতে প্রেম ভালবাসা আনন্দঘন মুহূর্তের উল্লাস আছে। ব্যক্তি জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে সমষ্টি জীবনের প্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে পাল পার্বণে সাঁওতালী উৎসবে এই গানগুলি গীত হয়। মাদলা মাদলের সুরে সুরে সুন্দর হলদিত হতো এই সব গান ছড়িয়ে পড়ে পাহাড় ঘেঁষা সাঁওতাল পল্লীতে। কখন কারা এ সব গান রচনা করেছে আজও তা জানা যায়নি। লোক জীবন থেকে উৎসারিত এইসব লোক গান মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হল।]

আশ্বিনের পূর্ণিমার পরে অমাবস্যা এলে
সরহায় পরবে মাতে মন।
সরহায় এসেছে সই
ঘর দুয়ার রঙে ও মাটিতে
এখনি লাগিয়ে নাও এই ত সময়
এ সময় চলে গেলে কি করবে তখন ?
সরহায় পরব সই হাতির মতন
ভয়কে ঠেকে তবে যুঝেছি এখন।

২ হাতির পারা সরহায় পরব কুথায় ছিলে কুথায় ছিলে ?
ছিলম ক্ষেতে নতুন মাঠে
ধানের আড়ে চোখের আড়ে
কত যতনের সাথে সাথে
আলায় আমি দুমদায় কাজে দুমদায় ঠেলে।

৩ ও সরহায় কোথায় ছিলে
কোথায় তোমার জন্ম এবং কেমন করে উদয় হলে ?

আমি হিহিক্কিতে জন্ম নিয়ে
পিপিক্কিতে উদয় হলাম
হিহিক্কিতে জনম আমার—পিপিক্কিতে গলে গেলাম।

৪ মাগো তুমি অনেক দূরে আমার দিলে বিয়ে
পরছায়ে কে আনবে বলো আমায় ঘরে নিয়ে?

কেঁদো না কেঁদো না মেয়ে—খারাপ কিসের মন?
তোমার ভাইয়ের সাথে আসবে আমার বাছাধন।

৫ দশ বারোটি নদী পাহাড় পেরিয়ে এলে দাদা
আমন্ত্রণের লিপি হাতে নেইকো কোন বাধা।
এই পিঁড়া এই চৌকি দিলাম বসো তুমি তাতে,
আমার প্রতি তোমার স্নেহ আগের পারাই আছে।

৬ আর দেরী নয় ওই দেখ ঐ ফুটলো কিংশুক
সন্ধ্যা নেমে আসবে প্রিয় নয়কো চোখের সুখ।
ডিনিবপত্রে যোট বেঁধেছি—ছেলেকে নাও কোলে
বাপের বাড়ির দেখবো পরব—দু'জনে যাই চলে।

৭ বাড়ির ধারে নাচে গানে বাজনাতে পর মেলা
সুরে সুরে মাগো আমার মন যে উতরোল।
উৎসবে যোগ দিতে করে ইচ্ছে আমার মন—
কিন্তু মাগো কে নেবে এই কোলের বাছাধন?

তোমার কোলের সোনার ছেলে রেখে আমার কাছে
পরব দেখে আয় কন্যা—কিসের বাধা আছে?

সাঁওতালী

ঘুয়া গান

সাধু রামচাঁদ মুরমু

উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর (দু'বার)

মায়ের বুকের সন্তান হয়ে চলবো একই পথ বয়ে
শত্রুকে চুটকিয়ে মেরে
হাসা দিয়ে দুঃখ দূর
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

টাঙ্গির যাটি ভেঙে গাড়ি খানাডোবা ভর্তি করি
বনপাহাড় সাফ করে
গড়বো নিজের নগর
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

কোল সাঁওতাল যাহারী মুন্ডা আমার ভাই রাভচন্ডা
ভিটে মাটি ছেড়ে দিয়ে
জঙ্গলে চুকবো না আর
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

পরীর ভয়ে জানে আর ধর্ম ভয়ে প্রাণে
দেখবো চেয়ে আইনে বীরে
ভাববো না আর শান্তবীর
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

ভারত মায়ের বুকের দুধ লুটবো খেতে উৎসুক
অচৈতন্য ঘুমের থেকে
পড়বো উঠে ঝটিয়
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

ধর্মজালে ধনী জাতি দুনিয়া জুড়ে পায় স্থিতি
আমার শুরু করার আগেই
উপায় খুজা যায়বার
উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর—

কন্নড় কবিতা

বি. আর. লক্ষ্মণ রাও

অনুবাদ : ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

[বি আর লক্ষ্মণ রাও বিশিষ্ট কন্নড় কবি। তাঁর জন্ম ১৯৩৬-এ। প্রতিবাদী কবি হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ পরিচিতি আছে।]

মহীলতা

না, এ আমার নয়,

বৃথাই পার্থিব অস্তিত্বের ছেড়ে
মহাশূন্যে নির্লিপ্ত পাক খায় মহাকালযান…
এভাবে কি ফিরে এসে লাভ আছে কোন ?

না, কিছুতেই আমার নয়
প্রবঞ্চক সে-যানের আসন,
শূন্যে ঘুরে-ঘুরে যার
পৃথিবীকে ধ্বস্ত করা কাজ…
তবু আমি খুঁজবো,
খুঁজবো মাটির তলে,
মিলবো পেটুক সেজে এর হৃদস্পন্দনে…
অতঃপর প্রতি রোমে সঞ্চারিত প্রাণরসে
ভূই প্রসারিত দেহে মাটির উদর থেকে
মুখ বাড়াবো…

শতখণ্ড করে যদি ছড়িয়ে দাও সর্বত্র
তবু যেন বেঁচে উঠি, বেড়ে উঠি গুণিতকে,
বড়ো ইচ্ছে বাঁচবো,
বাঁচবো কর্ণাটকের বন্য মহীলতা হয়ে…

বি ট ললিত নায়ক

[বি ট ললিত নায়ক (জন্ম ১৯৪৭-এ) বর্তমানে কন্নড় কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের ধরবারে এক স্বতন্ত্র উচ্চারণে চিহ্নিত।]

কৈফিয়ত

বলে বেড়াও, তুমি নাকি বাঁচাবে মানুষ…

তীব্র হট্টগোলের মাঝে তবু
কিভাবে যে বসে থাকো চেয়ারে !
এখন তো শুধুই দেশসেবা, তাই না ?

বিনীত অনুরোধটা শুনবে ভবে ?
ঐ পোশাকগুলো খুলে ফ্যালো এবার। মুখোশটাও।
বলো, ভাখাবে না সত্যি মুখ ?

আমরা যে শপথ করেছি
বাচ্চাদের ভাখাবো,
ভাখাবো হরেক মানব-ছবি,
পুরাণ ছুঁড়ে উঠে আসা মানব,
রক্তমাংসে সত্যি মানব গো, সত্যি।

মৃত্যু বিষয়ক দুটি কবিতা

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই কবিদের সঙ্গে মৃত্যুর গভীর সম্পর্ক। এমন কোনো কবি নেই যিনি এই ছদ্মবেশী সুন্দরীর পায়ের নোপন শব্দ শুনতে পাননি—সবদেশে, সবকালে, সবভাষার কবিদের রচনার ওপর চোখ বোলালে একাধিক দীর্ঘশ্বাস, অন্ততঃ একটি মৃত্যুবন্দনা এবং মৃত্যুঞ্জয়ী অমরত্বের স্পন্দন টের পাওয়া যায়। এই স্বল্প পরিসরে বেছে নেওয়া হল দুজন কবিকে—বঁদলেয়র (ফরাসী), এবং পাবলো নেরুদা (স্প্যানিশ) যারা দুটি ভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখেছেন।

দেখা যাক, মৃত্যু বিষয়ক এদের কবিতাগুলো ভাষান্তরে কতখানি অর্থবহ হয়ে ওঠে বাঙালি পাঠকদের কাছে।

গরিবের মৃত্যু

বঁদলেয়র

তবে তো মৃত্যুই শুধু সান্ত্বনার ভাষা, যাহা বেঁচে থাকতে বড়ো সাধ হয়
জীবনের লক্ষ্য যদি এই আর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাসনা এটাই
দমহ পতন থেকে তুলে ধরে আমাদের, ক্ষুব্ধ করে,
ধরা থেকে মুক্তি দেয় তাই
এবং ভরসা দেয়, যেন রোজ দিবসান্তে খনির্ভর হেঁটে যেতে পারি—

পুরু বরফের চাঁই, সঘন কুয়াশা আর সামুদ্রিক ঝড়
অন্ধকার, যেন সেই আলোকবর্তিকা পথ দেখাবার ছলে
একটি সরাইখানা বন্দোবস্ত থাকা—ওরা সকলেই বলে
যেখানে দুবণ্ড বসে খানাপিনা, দুপাত্তর টেনে
একটু ঘুমের সুখ, অন্তত আরামেই বসে থাকা যায়

এ কি তবে দেবদূত ? সর্বস্ব কর্তার মতন
ঘুম দেবে আমাদের, ঘুমের ভেতরে খুব উৎফুল্ল স্বপ্ন
এনে দেবে
এই সেই দেবদূত, উলঙ্গ, গরিব ছেলে, তবু যেন ভালবেসে তাকে
একটি মেয়ের হাত তার জন্য শয্যা পেতে রাখে

তবে কি কল্পনা করব, ঈশ্বরের ? খুলে এক রহস্যের জাল
গরিবের টাকশাল খালি হয়, লক্ষ্যভাগ করে কালনেমি
একদিন খুলে যায়, খুলে যাবে অনন্ত দুয়োরা
স্বর্গের বাগানে তার পদক্ষেপ, এই প্রথম
এর আগে কখনও আসেনি···

সেইসব মৃতদেহ
পাবলো নেরুদা

আর তারপর ঐ সাংঘাতিক মৃত্যুগুলো কী ভোগান যে ভুগিয়েছে আমাকে
কী বলব মশাই
সে যে কী ব্যথা, আর কত দুঃখের কাহিনী···
যেন কেউ শাস্তা করে পিটিয়েছে আমায়
হাড়ে হাড়ে কী বেদনা, মাগো
এইসব বাকিগুলো মৃত্যুগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম হ'তে হ'তে
একদিন আমরাও মরব নিশ্চিন্ত
কেননা এইসব মৃত্যুগুলো ওদের বেঁধে রেখেছে
কলকাতার উপকণ্ঠে, হলদিয়া বন্দরে—ঐ দুটো নাম
ফকির আর মিকি···
ওরা নখ চালিয়ে দিয়েছে ওদের চোখের মধ্যে আর জিভের মধ্য দিয়ে
ওরা রক্ত ঝরিয়েছে ওদের, অ্যাসিড পুড়িয়েছে
ওদের চরিত্রহনন করেছে, কী হাকিম অপমান করেছে
ওদের বাতিল লাশগুলো লাথি মেরে খালার মতো গড়িয়ে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ের দিকে
এইজন্য, ওইজন্য এবং সেইজন্য···অ্যাত্তোসব !
এ-ই ভাবে লাঞ্ছনা করা হল ওদের
ওরা ক্রুশবিদ্ধ হ'ল
যতক্ষণ না ওদের মনে রাখা হয়, কলকাতার সেইসব মৃত শহিদদের সঙ্গে
যাদের পচা গলা শরীর থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে ম-ম করে
চারপাশে বোঁ বোঁ করে উড়ছে হাংলা মাছির ঝাঁক
হাড়গোড় আর অস্ত্রশস্ত্রের ওপর যত্রতত্র পানের পিক আর থুতুর দাগ
যেন ময়নাপাখিদের ঘুমে কঙ্কালগুলো জমা হচ্ছে ভয়াবহ সাক্ষ্যঘরের সামগ্রী হিসেবে
কোঁটা কোঁটা রক্তমাখা মধু
টপটপ করে ঝরে পড়ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে
হারিয়ে যাচ্ছে সমস্ত মৃতদের সঙ্গে—চিরদিনের মতো···

ওড়িয়া কবিতা

খবরের পুরনো কাগজেরা

অরুণ কোলাটকার

ঐ যে ওখানে ছোট্ট তেপায়াটার উপরে
পুরনো খবরের কাগজ গাদা করে রাখা
ওগুলো থেকে সাবধান।

ওদের বিরক্ত করবেন না।
আমি ঠিক জানি
সাপেরা ওর মধ্যে ডিম পেড়ে রেখেছে।

ওদিকে তাকাবেন না পর্যন্ত।
কাগজের ধারগুলো ঐ যে নড়ে-চড়ে উঠছে
তা কিন্তু বাতাসের জন্যে নয়।

খবরের কাগজের ঐ বাসাটা জ্যান্ত
ফুঁসলী পাকাতে থাকা আর ফুলতে থাকা সদ্যোজাত সাপগুলো
ঘাড় ফেরাচ্ছে আপনাকে দেখবে বলে।

ঐ সাদা কোন্‌টা তার ফণা বিস্তার করছে।
একটা চেরা জিভ
ওর মুখগহ্বর থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।
আপনার চোখ বন্ধ করে রাখুন!
এইসব অনাবশ্যক রক্তক্ষরণ থেকে বাঁচান নিজেকে—যদি বাঁচতে চান
দিন শুরুর বেলা।

তেলুগু কবিতা

যেখানে জুতোর প্রেম চোখ মেলবে

সি নারায়ণ রেড্ডি

[কবি সম্পর্কে : জন্ম ১৯৩১ সালের ২৯ জুলাই। সুপরিচিত কবি ও প্রাবন্ধিক। তেলুগু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। 'জ্ঞানপীঠ', 'সাহিত্য আকাদেমি' প্রভৃতি বহু সম্মানে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ চল্লিশের বেশি।]

অন্যের মতো আমিও
কদাচিৎ হেঁটেছি আমার এই দুটি পায়ে।
কিন্তু আজই
চোখ দুটিকে সঠিক রেখে
চলেছি আমি হেঁটে।
জুতোর ফিতের চেয়ে কি
চোখের পাতা ছিলে ?
পদক্ষেপ হরিণ শিশুর চেয়েও হাল্কা ?
জুতোর তলি চোখ মেলে
মনোযোগের সঙ্গে দেখছে
শিশির ভেজা কাল দুলছে
বহমান বাতাসে
এবং শোভাযাত্রা করে চলেছে
ছাগলেরা—
আমার জুতোর তলি
তখন দেখলো :
'আহা ! কতো প্রজন্মের অবিচার !
হেঁড়ে যাবার দুঃখ আমাদের,
আমরা তাদের।'

আত্মকথা

এম গোপী

[কবি সম্পর্কে : জন্ম ১৯৪৮ সালে। ৮টি কাব্যগ্রন্থ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক হিসাবেও পরিচিত। বহু পুরস্কারে সম্মানিত।]

এখানে
প্রযুক্তির সাফল্যের জন্য
সত্যকে দিতে হবে বলি,
পাতিব্রত্যকে রক্ষার জন্য
করতে হবে ব্যাভিচার।
জঘন্য-হিংসাকে রক্ষার জন্য
মসজ-শৃঙ্গারকে করতে হবে পাহারাদার।
প্রশান্তির জন্য
ভাগীদার করতে হবে অশান্তিকে।
মন্দ হাসির জন্য
বহাতে হবে অশ্রু।
আবেগের জন্য
করতে হবে যাচ্ঞা।
স্পষ্টতার জন্য
হতে হবে কাপুরুষ।
এখানে
কবিতার জন্য
কাকের মতো কা-কা করতে হবে।

হিন্দি কবিতা

শবরী ঘোষ

দুর্ঘটনা
চন্দ্রকান্ত দেওতালে

আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম
আর আমার মাথার ভিতরে
গুঞ্জন করছিল রবিশঙ্করের সেতারের কিছু টুকরো
আমার ডান হাতে ছিল এক গুচ্ছ চাবি,
অকারণে ঝঙ্কার তুলছিল তারা।

তারপর চৌরাস্তার মোড়ে এসে একথা প্রকট হয়ে গেল
আমারই ছায়ার থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে এক ছায়া
এবং আমার দিকে এমন বিচিত্র চোখে চেয়ে আছে,
যেন—সে 'মানুষ' নয়
কোনো এক হিংস্র পশুকে দেখছে

সে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে
জানতে চাইল—
তোমার ডান হাতে এই চাবিগুলো কেন ?
আমাকে সত্য বল, উদ্দেশ্য কি তোর ?

এ সময় আমার ভিতরে কিছু জ্বলছিল না তো
পথ দিয়ে পা দুখানি চলছিল শুধু
আমি বললাম—কিছুই বলার মত আমি দায়বদ্ধ নই,
তবুও বলছি—
সময়ের যন্ত্রিক থেকে ফেলে এটা ছায়াশূন্য রেখে
শান্ত হয়েছে যেমো হাওয়া ;

সুতরাং আমিও তো প্রশ্ন করতে পারি,
তুমি কে ?—কিন্তু সে সবও আমি জানতে চাই না।

এই চাবিগুলি, জেনো, একান্ত আমারই
কিন্তু আমি জানি না যে, সে কোন্ ধরণা
যার সাথে ঝুলে থাকা সঠিক তালার সঙ্গে
কবে কোন্ শুভক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটবে এদের !
গর্জে উঠল সে—তোর এত দুঃসাহস !
তখন পকেট থেকে তার
আরো কিছু লোক বাইরে বেরিয়ে এল ;
পিছমোড়া বাঁধল আমাকে,
আর শক্তহাতে টিপে ধরল গলা…

যখন আমার সংজ্ঞা ফিরে এল ফের,
চেয়ে দেখি—তারা সব উধাও হয়েছে

আমার ভিতরে সেই সেতারের আশ্চর্য গুঞ্জন গিট ধরে গেছে,
দোমড়ানো চাবিগুলি
পড়ে আছে কিছুটা দূরেই
মনে হল, সময়ের যন্ত্রিকের পুতীভূত ভার
আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করেছে,
আর সমস্ত হাওয়ার গাঁঠরির মধ্যে
আমাকে আবদ্ধ করেছে কেউ

এখন ভাবনা করার মত কিছু নেই আর
কেবল কানের কাছে কটি শব্দ সারাক্ষণ গুঞ্জরণ করে
'চেষ্টা করো,
চেষ্টা করে যেয়ো'… ।

মণিপুরী নর্তনালয়

লায়লী ঘোষ

মণিপুরী নর্তন—

ভারতবর্ষের ক্লাসিকী নৃত্যধারার খ্যাতি বিশ্ববিদিত। ক্লাসিকী ধারার শাখাগুলিতে মণিপুরী নৃত্যের স্থান অন্যতম। একটি পর্বতবেষ্টিত উপত্যকাভূমি তার দুর্গম পথের জন্য অন্যান্য জনস্থান থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েও তার শিল্পশৈলীর এ অনন্য সৌন্দর্য কিভাবে লাভ করল, তা বিস্ময়ের বিষয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বাইরের পৃথিবী মণিপুরের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং তার অধিবাসীদের শিল্পচেতনাময় আত্মিক সৌন্দর্যে। সেই চেতনার সঙ্গে যখন বহির্বিশ্বের অন্য ভাবনা মিলিত হল; যেমন—শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবনা ইত্যাদি —তখন তার ফললরূপে আমরা পেলাম মণিপুরের অসাধারণ সৌন্দর্যময় লাস্য-তাণ্ডবে কোমলে-কঠিনে গঠিত ক্লাসিকী নৃত্যকলা।

বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারের বহু পূর্বকাল থেকেই মণিপুরে ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের প্রয়োগ ছিল। সেইসব লৌকিক অনুষ্ঠানের নৃত্যগুলি পরবর্তী সময়ে পরিশীলিত হয়ে উঠল, নিয়মিত অনুশীলন ও চর্চায় তাদের শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্তি ঘটল। মণিপুর রাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সর্ববিধ আনুকূল্যে নৃত্যগীত বাদ্যাদির যথাযথ মান ও চর্চানুশীলন চলার জন্য তৈরী হয়েছিল 'পালা-লোইশার'। মণিপুরের অধিবাসীদের সহজাত শিল্পচেতনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিষয়গুলির মেলবন্ধনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মণিপুরী নৃত্য। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময় থেকে (১৭৭০ খ্রীঃ) গুরুদের যে রচনাধারা শুরু হয়েছিল, অদ্যাবধি সেই সৃজনীধারা অব্যাহত। মণিপুরের সংগঠনশিল্পী ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে বাংলার কোমলতা ও সাংস্কৃতিক ভাবনার সাদৃশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম মণিপুরের বাইরে মণিপুরী নৃত্যকে শান্তিনিকেতনের পাঠক্রমে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেন। পরবর্তীকালে শ্রীমতী লীলা রায়, যিনি যাদবা মেনকা নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর প্রতিভার মেনকা ইতিমধ্যে ব্যালেতে (Winners of the 1st prize in the International Dance Olympiad, Berlin 1936), উদয়শংকর পরিচালিত আলমোড়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেসব গুরুরা এইসব নৃত্যপ্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নবকুমার সিংহ, বিহারী সিংহ, গুরু আমুবী সিংহ, গুরু আতোম্বা সিংহ, নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার সোনারিক সিংহ প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী নর্তনালয় কী ও কেন ?

মণিপুরী নৃত্যের প্রচারের জন্য গুরু বিপিন সিংহ, আত্মেরী তরীগণ ও কলাবতী দেবীর সহায়তায় ইম্ফল, কলকাতা ও মুম্বাইতে মণিপুরী নর্তনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মণিপুরী নর্তনালয় একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত মণিপুরী নৃত্যচর্চাকেন্দ্র। এখানে কেবলমাত্র নৃত্যের কলিত চর্চাই নয়, তাত্ত্বিক চর্চাও হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে গবেষণাকেন্দ্রের

কাজ চলার জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু মৌলিক ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে যারা এই নৃত্যচর্চা করতে আসেন, তাঁরা যাতে এই নৃত্যকে সার্বিকভাবে উপলব্ধি করে,—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশী ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, মণিপুরী নৃত্যকে আত্মীকরণ করতে পারেন, তারই প্রয়াসে মণিপুরী নর্তনালয়ের শিক্ষাদান। এক কথায় বলা যেতে পারে, মণিপুরী নৃত্যের বিশ্বায়ন ও যথাযথ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মণিপুরী নর্তনালয়ের কর্মকাণ্ড নিবেদিত।

গুরু বিপিন সিংহ—

মণিপুরী নৃত্য শব্দটির সমার্থক একটি নাম আমাদের সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে জানা—সেই নাম হল গুরু বিপিন সিংহ। তাঁর আশি বছরের পদার্পণের দিনটি আমরা গতবছর আগস্ট '৯৭ উদ্‌যাপন করেছি। কাছাড় জেলার শিলচরে তাঁর জন্ম হয়। আটৈশব পারিবারিক পরিবেশের জন্য তিনি নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিগত ষাট বছর ধরে তাঁর সেই আকর্ষণ সাধনার বিষয় হয়েছে। মণিপুরের বিভিন্ন নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি বিষয়ের গুরুদের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানে পুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতিভাভাণ্ডার। পরবর্তীকালে তাঁর পরিক্রমা শুরু হয়েছে এই নৃত্যের প্রচার ও প্রসারমন্ত্রে। ভাতেরী তরীদের সহায়তায় মণিপুরী নর্তনালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থভাণ্ডার যে কোন নৃত্যসেবীর কাছে অমূল্যবান সম্পদ। ভারতীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমী, কালিদাস সম্মান, কুমারলক্ষা পুরস্কার, শিরোমণি, রাজ্য নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা একাডেমী পুরস্কার, মণিপুরের মহারাজার ঘোষণা সর্বোচ্চ পুরস্কার 'হানজাবা' 'নর্তনাচার্য' প্রভৃতিতে তিনি ভূষিত। এছাড়া দেশ-বিদেশের নানা নাগরিক সম্মান ও সম্বর্ধনায় তিনি সম্মানিত।

পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভ থেকেই তিনি গবেষণামূলক কাজে ব্যস্ত আছেন। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে একক মণিপুরী নৃত্যের প্রদর্শন তাঁর একক কীর্তি। গুরু বিপিন সিংহের এই যুগোপযোগী পদক্ষেপ পরবর্তী সময়ে মণিপুরে 'একক নৃত্য উৎসব' এর প্রচলনকে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া রাস বা নট সংকীর্তনের মত পবিত্র, ধর্মীয় এবং দীর্ঘ নৃত্যকে তিনি বিন্দুমাত্র ভক্তিভাব ও রসের হানি না করিয়ে গতিময় সৌন্দর্যে ভূষিত করে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে প্রদর্শন করিয়েছেন। শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্যের ভাণ্ডারে তাল, বোল, গীত ও নৃত্যরচনায় আজও তিনি অক্লান্ত।

মণিপুরী নর্তনালয়ের রজতজয়ন্তী

মণিপুরী নর্তনালয় এখন কাজে ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। বিগত পঁচিশ বছরে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানে গুরুমুখ প্রথা ও আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্থানাভাব সত্ত্বেও গুরুজীর বাড়ীতে থেকে শিক্ষালাভ করেন। কলকাতার ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত নৃত্যচর্চা করেন। সম্ভবতঃ এটাই কলকাতার এমন একটি নৃত্যকেন্দ্র যেখানে দিন-রাত, সময়-অসময়ের প্রশ্ন নেই, ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনে যে কোন সময় গুরুজী বা কলাবতী দেবীর কাছে এসে উপস্থিত হন। গত পাঁচিশ বছরে আমেরিকা, ডেনমার্ক, জার্মান, গ্রীস, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রায় কুড়ি জন বিদেশী এখানে থেকে নৃত্যশিক্ষা করেছেন। গত তিন চার বছর ধরে I. C. C. R. এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরাও এখানে নাচ শিখেছেন। তাদের মধ্যে তমন্না রহমান, পদ্মিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তা চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যজগতে প্রীতি প্যাটেল, প্রতি ব্যানার্জী, পৌবালী চ্যাটার্জী প্রমুখ শিল্পীরা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

মণিপুরী নৃত্যজগতের যাবতীয় বিষয়গুলি নর্তনালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। মণিপুরী নৃত্য এবং ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের উপরেও নিয়মিত পঠন-পাঠন ও গবেষণাকেন্দ্র। এই মণিপুরী নর্তনালয় প্রায় ১০টির মত পুস্তক প্রকাশ করেছে।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যেসব ছাত্রছাত্রীরা গুরুজীর অনুপ্রেরণায় এই নৃত্যের প্রচারের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীমধুন দে (আমেরিকা), শ্রীসুকল্যাণ ভট্টাচার্য (কানাডা) শ্রীমতী গৌরী ঘত (মণিপুরী নর্তনালয়), শ্রীমতী লাইলী বসু (পার্কসার্কাস কলাবতী ডান্স সেন্টার), শ্রীমতী গৌরালী চট্টোপাধ্যায় (জেনিক), শ্রীসজীব ভট্টাচার্য (অজন্তার), শ্রীমতী সুচরিতা পর্ষা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম সংযোজন ডঃ দীপা দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় মণিপুরী নর্তনালয়ের একটী শাখা (ডানকুনি) স্থাপন।

গত পঁচিশ বছর ধরে গুরুজী, দর্শনা জাভেরী ও কলাবতী দেবীর সঙ্গে যারা কলিত ও তাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে গবেষণা বিভাগে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ দীপা দাশগুপ্ত ও ডঃ তপা সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুর বিভাগে গুরুজীর তত্ত্বাবধানে বহু ছাত্র শিক্ষারত। উত্তীর্ণ ছাত্ররা সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে শ্রীযুত সিংহ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীসুশান্ত দাস (বনস্থলী ইউনিভার্সিটি, রাজস্থান), শ্রীজগরূপ সিংহ (বাংলাদেশ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী নর্তনালয়ের প্রযোজনার তালিকাকে দীর্ঘ বলা যেতে পারে। পারম্পরিক মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস, কুঞ্জরাস, গোপরাস ছাড়া সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয় নৃত্যের আধারে গোপীগোষ্ঠ, নৃত্যমালিকা, গৌরচন্দ্রিকা; মণিপুরী ও ওড়িশী আঙ্গিকে মিলিত প্রযোজনা—মহারাস ছাড়াও কবিগুরুর তাহুসিংহের পদাবলী, কালমৃগয়া, চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ প্রভৃতি প্রযোজনা দর্শকমন প্রশংসিত ও দেশ-বিদেশে প্রদর্শিত। এইসব প্রযোজনার জন্য কলাবতী দেবীর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। স্বর্গতা নয়না জাভেরী ছাড়াও আরও অনেকে বন্দিত ব্যক্তিত্ব আন্তরিক আনুকূল্যে নর্তনালয়ের এই যৌবনপ্রাপ্তি। আরও বহু ছাত্রছাত্রী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতি বছর বৃত্তি পাচ্ছে। মণিপুরী নর্তনালয়ের কলকাতা শাখার পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ গুরুজী ও কলাবতী দেবী নিয়েছেন। তার সঙ্গে রয়েছেন ইন্দ্রাণী দেবী। মুম্বাই শাখার দায়িত্বে আছেন—রঞ্জনা জাভেরী ও লতালনা দেবী। ইন্দ্রপ্রস্থ শাখার দায়িত্বে আছেন—প্রবেশরী দেবী ও মনোরমা দেবী।

মণিপুরী নৃত্যের প্রচারে মণিপুরের বাইরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে মণিপুরী নর্তনালয় একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান।

গালিবের কবিতায় প্রেম

পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়

উর্দু কবিতায় বিষয় হিসাবে প্রেম বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, তা সে উর্দুর আদি কবি গোলকুণ্ডার বাদশাহ কুলীকুতুব শাহই হোন বা কোনো সাম্প্রতিক কালের কবিই হোন, প্রেম তাঁদের রচনার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই মির্জা গালিবের কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং তাঁর কবিতায় প্রেমকে আমরা নূতন রূপে দেখতে পাই।

গালিবের পূর্বে উর্দু কবিতায় প্রেমকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তা হলো ফার্সী সাহিত্য থেকে ধার করা। তা ছিল শুধু চিরাচরিত ও বিশ্বস্ততায় ভরা। সেই চিরকালীন শীরিঁ ফরহাদ লৈলা মজনুর পুরোনো কাহিনীরই ছন্দোবদ্ধ রূপ এবং শুধুমাত্র শারীরিক ও যৌনতায় এক কল্পনা। এর ব্যতিক্রম খুবই কম ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রেমের আধ্যাত্মিক জগতের বা টানাপোড়েনের কথা আমরা খুব কম পেয়ে থাকি। এর কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, তখনকার কবিদের চোখে প্রেম শুধুমাত্র নানা রঙের ফুলেভর্তি ফুলদানি বৈ কিছু নয়। কিন্তু ফুলের যে কাঁটা আছে, ফুলেও যে আগুন জ্বলে বা তা আহরণে আমাদের যে কত বিক্ষত হতে হয়, যন্ত্রণা হয় সে কথা সম্ভবত গালিবই প্রথম বাস্তবসম্মতভাবে পাঠকের দরবারে হাজির করেন।

গালিবের কবিতা বা গজলে প্রেম অনিবার্যভাবে এসেছে, কিন্তু তা এসেছে নিত্য নূতন রূপে। অবশ্য গালিবের লেখার প্রথম দিকে আমরা সেই পুরোনো পরম্পরারই ছাপা পাই। কিন্তু ফুলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গালিবও পরিবর্তিত হয়েছেন। প্রেমের সঙ্গে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত জড়িয়ে গ্যাছে। যদিও গালিবের কবিতায় রূপ, সৌন্দর্য, প্রেম এক সিংহভাগ স্থান দখল করে আছে। তবুও সে প্রেমের চেহারা ভিন্ন। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে, আছে প্রেমের যৌবজ্বালা।

গালিবের কবিতায় এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল তখনকার লোকাচার, সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ। এই পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গেলে তাঁর বংশ, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সে সময়ের পরিস্থিতি, তাঁর মানসিক ভাবনার জগৎকেও উপেক্ষা করা চলে না। কেননা তাঁর প্রেমের কবিতার নির্মাণ শিল্পে এ সমস্ত কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গালিবের পরীরে ছিল মোগল রক্ত, যে মোগলরা যুদ্ধ, বাহাদুরী, বীরত্বের পাশাপাশি রূপ সৌন্দর্য ও সুন্দর সম্ভার যথার্থ প্রেমিক। যাঁদের চিরকালীন পেশা ছিল সিপাহীগিরি। যাদের কাছে সাহিত্য বা কাব্য সম্মানের মাধ্যম না হওয়া সত্ত্বেও শেরশায়রী তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সৌন্দর্যানুভূতি, সাহিত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়েছিল। বংশগত এই ধারা গালিবকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, কেন না রাজ্যপাল, যুদ্ধ, তলোয়ারের ঝনঝনানি, বিশাল অট্টালিকা—এইরকম এক জগতে গালিব প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। এইজন্য তাঁর বাল্যকাল প্রাসাদ, অট্টালিকার মধ্যে কাটে কিন্তু পরে প্রতিকূল অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় সেসব বৈভব শেষ হয়ে যায়। তবুও তিনি অভিজাত চালচলন ত্যাগ করতেও পারেননি। তাঁর অসাধারণ ভাবনার জগত ও অনুভূতিই তার প্রমাণ। গালিবের দেখার ও পরিবেশের এই বিশেষত্বই তাঁর প্রেমের কবিতা ও কল্পনাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

রূপ ও সুন্দরের প্রতি আসক্তি গালিবের ব্যক্তিত্ব ও কবিতা উভয়ের মধ্যে শুধু উপচে উঠেছে তাই নয়,

তাঁর একাকীত্বের পরিণাম বলা যেতে পারে। তিনি রূপ ও প্রেমের বর্ণনা অত্যন্ত কুশলতা ও দুঃসাহসের সঙ্গে করেছেন সেই যুগে, যখন সভ্যতা আজকের মত পাশ্চাত্য ঘেঁষা ছিল না। সে সময় গালিব প্রেমের ব্যাপারে যা কিছু ভাবতেন তা তিনি কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে নিয়ে এসেছেন, যা তাঁর প্রেমের কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট। তাঁর শিষ্য মৌলানা অলতাফ হুসেন হালির মতে—"গালিব চিরকাল ভবিষ্যৎ থেকে দূরে থেকেছেন।"

আর এই কারণেই গালিবের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি বিষয়ে আবেগসর্বস্ব না হয়ে হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত। এর দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে গালিব এতে ডুবে যাচ্ছেন এবং এই সৌন্দর্যের তীব্র অনুভূতিই তাঁকে প্রেমিক করে তুলেছিল। রমণীর সৌন্দর্যের প্রতি ছিল গালিবের গভীর আসক্তি। শুধু রূপময় নারীর চঞ্চল স্বভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কলকাতা সফরের সময় কলকাতার যা কিছু তিনি দেখেছিলেন এবং যে পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার স্মৃতি চিরদিন তাঁর হৃদয়ে তীরের মত গেঁথেছিল। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলে ওঠেন—

"কলকত্তে কা জো জিক্র কিয়া তুনে হমনশীঁ!
ইক্তীর মেরে সীনে পে মারা কি হায়! হায়!
ওহ সব্জাযার হায় এ মুতরা কি হায় গজব
ওহ নাজনীনোঁ বুতা ঘর আরা কি হায়! হায়!
সবর আজমা ওহ্ উনকী নিগাহেঁকি হমে—নজর
তাকতরুবা ওহ্ উনকা ইশারা কি হায়! হায়!

[ওহে বন্ধু! হায় হায়! কলকাতার কথা বলে তুমি আমার বুকে একটা তীর মারলে অর্থাৎ কলকাতার কথা মনে পড়ে আমার মন ছটফটিয়ে উঠল। হায়! হায়! কলকাতার নাম শুনতেই মনে পড়ে গেল তার সেই সাক সুতরো উঠান ও সুন্দরীদের কথা। আহা! তাদের সেই অসাধারণ চোখ, খোদা তাদের দুষ্টি থেকে রক্ষা করুন। তাদের সেই মনোলোভা ইশারার কথা মনে পড়ে গেল, হায়! হায়!]

রূপ, রূপের তহিমায়, তার চঞ্চলতায়, তার মনোহারিত্বে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন গালিব। তাঁর কল্পনায় ফুটে উঠেছে প্রেমিকার রূপ, চালচলন, তার ভাবভঙ্গী, ঠোঁট নড়ানো থেকে আরম্ভ করে পায়ের নখের বর্ণনা পর্যন্ত। তাঁর কল্পনায় প্রেয়সী কখনো শিশিরবিন্দু, কখনো আগুন। কখনো তিনি প্রেমকে বলেন পৃথিবীর অস্তিত্বের দীপশিখা। গালিব মনে করেন সৌন্দর্য এবং প্রেম পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

প্রেম মানুষের রক্তে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রেমের প্রতি একটা আসক্তি আছে। রূপহীন নর নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। আর রূপের গর্ভ থেকেই প্রেমের জন্ম। রূপমুগ্ধতা কানায় কানায় পূর্ণ হলেই প্রেমের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। মানবজাতির আদি নর আদমের ক্ষেত্রেও হয়তো এটাই ঘটেছিল। ইভের রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার পর মুহূর্তেই এসেছিল প্রেম আর শারীরিক মিলনের তীব্র আকাঙ্খা।

যাই হোক, রূপ ও প্রেম সম্পর্কিত কবিতায় গালিব যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন এবং যে গভীর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্য এবং প্রেমকে নিজের কবিতায় এনেছেন তা উর্দুর আর কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতায় প্রেম সৌন্দর্য নূতন রঙে ঝলমল করে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নারীকে, তার রূপকে দেখেছেন, প্রেমের নানা অবস্থার ছবি এঁকেছেন। যার দ্বারা তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের সন্ধান আমরা পাই।

কোনমতেই তাঁর প্রেমের কবিতাকে উদ্ভট কল্পনা বা কই কল্পনা বলা যায় না। সেই লায়লা মজনুর চিরাচরিত উন্মাদ ও উদ্ভট প্রেম থেকে নেমে এসে বাস্তব রক্তমাংসের দুনিয়ায় যা রাখে গালিবের প্রেম। তাঁর কবিতাকে কেউ কেউ হেতু প্রেমের কবিতা বলেছেন। প্রেমিকাকে গালিব রঙীন পুতুল হিসাবে রাখেননি, দেখেছেন রক্তমাংসের নারীকে, তার ভেতর প্রাণ সঞ্চার করেছেন। সেই প্রেমিকার কল্পনায় তিনি হারিয়ে যান, তাকে খোঁজেন—

"দিল্ ঢুঁড়তা হ্যায় ফির ওহী ফুরসত কে রাত দিন
বৈঠে রহে তসব্বুরে জানাঁ কিয়ে হুয়ে।"

(অবসরের সেই দিনগুলোকেই মন খুঁজে বেড়ায়, যেখানে শুধুই তার কল্পনায় মগ্ন হয়ে থাকা।)

তিনি শুধু রূপের প্রশংসা এবং প্রেয়সীর কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, তার চরিত্রকেও তুলে ধরেন। কখনো আবার স্বভাব ও বিশ্বাসের কল্পনায় ভেসে যান। কখনো তিনি প্রেম ও প্রেমিকার কেশরাশিতে হারিয়ে যান। লজ্জিত হন তাকে অত্যাচারিণী ভেবে—

"কতী কেকী তী উনকে জী মেঁ অপনে আজারে হ্যায় খুব্ সে।"
বকারেঁ করকে অপনী হাম পশমা তারে হ্যায় খুব্ সে।"

(যদিও কখনো ভুলেও তাঁর হৃদয়ে আমার মঙ্গল করার বাসনা এলেও যায়, তাহলেও সে নিজের অত্যাচারের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়।)

স্পষ্টবাদিতা গালিবের ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট দিক। তা সে খোদার সামনেই হোক বা প্রেমিকার সামনেই হোক। নির্দ্বিধায় নির্দ্বিধায় স্পষ্ট কথা বলেন। খোদা বা প্রেমিকা যার সম্মুখেই হোক না কেন তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন তিনি একজন প্রেমিক। উর্দু কবিতায় এই ধরণের স্বীকারোক্তি গালিবের পূর্বে প্রায় তাথাই যায় না।—

"না করহা ওহ্ তমান্না কী হসরত কী মিলে যায়
রাবব! অপর উন্ করহা তমান্না কী সজা হ্যায়।"

(যদি আমি আরো দীর্ঘ জীবন পেতাম তাহলে আমি সেই অপরাধ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মরতাম না। অপরাধটাই করে যেতাম। আমার কৃতকর্মের সাজা আমি নিশ্চিত পাবো, কিন্তু যে অপরাধ আমি করতে পারিনি এবং যা করার জন্য আমার মনে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে, খোদা সেটার তো প্রশংসা করবেন।)

তাঁর সাহসই তাঁকে চিরাচরিত প্রেমের কল্পনার বাইরে নিয়ে এসেছে। যেমন তিনি বলেন—

"বুলবুল কে কারোবার পে হ্যায় খন্দা-হায়-এ-গুল
কহতে হ্যায় জিনকো ঔর খলল হ্যায় দিমাগ কা।"

(ফুল হেসে হেসে প্রস্ফুটিত হয়, এই দেখে বুলবুল অভিযোগ করে। আসলে বুলবুলের এই দুঃখে ফুল হেসে ওঠে।)

এর অর্থ এই নয় যে প্রেম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা এই রকম। বিরাজমান চিরাচরিত প্রেমের কল্পনা তাঁর কাছে মস্তিষ্ক বিকৃতি মনে হয় যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এই পংক্তি দুটি লিখেছেন। যুক্তিগ্রাহ্য প্রেমের কল্পনার ক্ষেত্রে গালিব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

প্রেমের সামগ্রিক অনুভূতি ও অর্থ সম্পর্কে গালিব অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন তার গুরুত্ব ও শিল্পকে। অনেক সমালোচকের মতে গালিব প্রেমকে আবেগ দিয়ে নয়, মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝেছিলেন।

রোমান্সের আবেগে তিনি ভেসে যাননি, কল্পনাকে মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রেমকে চিনেছেন।

রূপ ও প্রেমের কল্পনায় প্রচলিত ধারাকে গালিব দ্বিধাহীন ভাবে ভেঙে বাস্তবমুখী করে তুলেছেন নিজের কবিতায়। কিন্তু সেসব আদৌ কবি কল্পনা বলে মনে হয় না।

বিখ্যাত উর্দু কবি হসরত মোহানী বলেছেন, "মির্জার কবিতা প্রেমপূর্ণ ঠিকই কিন্তু তাঁর কাছে প্রেমের অর্থ সম্ভোগ বা লালসা নয়। সেজন্য তাঁর কবিতায় মলিনতা ও নীচতার পরিবর্তে আমরা এক অসাধারণ সভ্যতা ও শিষ্টাচারের ভাষা পাই।"

গালিবের মতে—"মানুষের মুখ্য বিশেষত্ব তার পুরুষকার, যদি মানুষের মধ্যে এটাই না থাকে তাহলে কিছুই নেই। আর পুরুষত্বের পরিচয় তার হৃদয়ে প্রেমের বাসা থাকা।"

উর্দু সাহিত্যিক মজনু গোরখপুরীর মতে, "মানুষ এবং প্রেম গালিবের কল্পনায় একই শক্তির দুটি নাম।" প্রেম অত্যন্ত কার্যকরী এবং ঈশ্বরীয় শক্তি। যাকে মুখ্য গুণ বলে। এটা সত্যি যে, কখনো কখনো গালিব সাধারণের পরিচিত প্রেমের কল্পনার কথা বলেছেন—

"ঈশ্ক্ নে গালিব কো নিকম্মা কর দিয়া—
বর্না হম ভী আদমী থে কাম কে।"

(প্রেমই গালিবকে অকর্মা করে দিয়েছে, নাহলে সেও কাজের লোক ছিল।)

এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে প্রেম এবং জীবন উভয়েই কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মানুষের জীবনে। জীবনের সর্বস্তরের কবি হওয়া সত্ত্বেও জীবনের ক্ষেত্রে প্রেম যে কতটা প্রাকৃতিক সত্য এর ভেতর দিয়ে এটাও বোঝাতে চেয়েছেন।

গালিবের রচনায় রূপ ও প্রেমের অসাধারণ কবিতার কোন কমতি নেই। প্রেমের রাজ্যে গালিবের সাবলীল বিচরণ ও সততার দৃষ্টান্ত একটা নজীরবিহীন ব্যাপার। গালিব অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে স্থূল আবেগকে পরিত্যাগ করেছেন। কারো কারো মতে গালিব জীবন ও প্রেমে দান্ত লোকসান, লেনদেন, প্রচেষ্টা ও সার্থকতার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন।

যাইহোক, গালিবের প্রেমের কল্পনার বিষয়ে একথা পরিষ্কার যে, তার কল্পনায় প্রেমের রঙ ঢঙ আছে, আছে নির্জনতার একাকীত্বের দর্শন। তাঁর মতে জীবন একটা যন্ত্রণা, প্রেম তার ঔষধি। যদিও প্রেম নিজেই উপশমহীন যন্ত্রণার একটি নাম। গালিবের কবিতায় তাই ফুটে ওঠে—

"ঈশ্ক্ পর জোর নহী হৈ য়হ্ বো আতশ্ গালিব
জর্ কী খাওয়া পায়ী জর্ বের্ খাওয়া পায়া।"

(প্রেমেই জীবনের আনন্দ পেলাম। দুঃখ ভোলার ওষুধ পেলাম। সেইসঙ্গে এমন দুঃখ পেলাম যার কোন ওষুধ নেই।)

সবশেষে এই সত্যটা আমাদের সামনে প্রকট হয় যে, গালিবের জীবনে, তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রেম ও প্রেম সম্বন্ধীয় রূপ একদম ঘুলে মিলে গেছিল। জীবনের রৌদ্রছায়ায় তিনি প্রেমকে পরখ করেছেন, নূতন পোশাক পরিয়েছেন। চিরাচরিত রীতির বাইরে এসে প্রেম ও প্রেমিকার রূপ যৌবন ও তার সাজসজ্জার দিকে চোখ তুলেছেন। আপাদ-মস্তক প্রেমিক গালিবই পারেন প্রেমিকার জন্য সিংহাসন নয়, তাকে বসতে দেওয়ার জন্য সামান্য চটের সন্ধান করতে। কারণ তিনি জানেন তার এই প্রেমিকা রক্ত-মাংসের মানবী। তাকে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ওঠা ভালবাসা

জবাবে পত্রপাঠেই বলতে দেওয়া যায়, এতেই সে খুশী হবে। তার আসার খবরে ছটফট করে উঠেও বিচলিত হয়ে ওঠেন, কিসে বসতে দেবেন তাকে—

"খী খবর সর্ম উনকে আনেকী
আজই ঘর মেঁ খোরিয়া ন ছয়া।"

(শুনেছি আজই নাকি সে আমার ঘরে আসবে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আজই আমার ঘরে একটা বস্তা পর্যন্ত নেই যে তাকে বসতে দেব।)

গালিব প্রেমে বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয় করেন না। তিনি জানেন বরবাদ হয়ে যাওয়ার মত বস্তু তার কিছু নেই। আছে মাত্র একটা আকাঙ্খা তার সঙ্গে ঘর করার। সেটা শেষদিন পর্যন্তই ছিল তাঁর। তাই বলতে দ্বিধা হয় না—

"ঘর মেঁ থা হী ক্যারো কি তেরা গম উসে গারত করতা
ওহ্ জো রখতে থে হম ইক্ হসরতে-তামীর, সো হ্যায়।"

(আমার ঘরে ছিলটাইবা কি যে তোমার দুঃখ তাকে বরবাদ করত? সেই প্রথম থেকেই একটাই আকাঙ্খা ছিল সংসার করা, তা সেটা এখনো আছে।)

এইভাবে প্রেমের প্রতিটি স্তরী, প্রতি পদক্ষেপের ওপর ভাবনাচিন্তাকে গালিব কলমবন্ধ করেছেন। প্রেমানুভূতির দর্শন এত গভীরে, তার অভিব্যক্তি এত তীক্ষ্ণ যার নাগাল পেতে পাঠক অনেক সময় হিমসিম খেয়ে যান।

SPACE DONATED BY—

A

WELL

WISHER

নোবেল সাহিত্যিকের রচনা

(ইতালীয় নাটক)

পিন্ বল খেলোনা আর কেন জেলস্

দারিও-কো

অনুবাদ : শচীন দত্ত

বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা দারিও কো জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ সালের ২৪শে মার্চ, উত্তর ইতালির লম্বার্ডিতে লেগ গিউনো-ম্যাগিয়োরো নামে একটি গণ্ডগ্রামে। তাঁর পিতা ফেলিস কো ছিলেন একটা ছোট রেলস্টেশনের স্টেশন মাষ্টার, আর মা পিনা ছিলেন কৃষিক্ষেত্রের একজন শ্রমিক। ছোটবেলা থেকে দারিও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন—তাঁর প্রিয় খেলনা ছিল পুতুলনাচ অভিনয়ের স্টেজ। বড়ো হয়ে তিনি মিলানে স্থাপত্য বিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেন। কিন্তু দারিওর নেশা ছিল অভিনয়ে, সেটাই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়াল। তিনি রেডিওর জন্য নাটক লিখে অভিনয় করতেন, যুকাভিনয়ও দেখেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বিয়ে করেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ফ্রাঙ্কা রামেকে। দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ক্যাম্পানিয়া-দারিও কো—ফ্রাংকোরামা নামে এক নাট্য-কোম্পানী ১৯৫৯ সালে। দারিও বামপন্থি ভাবধারায় ব্যঙ্গ নাটক, হাস্য-কৌতুক রসরচনা, কমিক ও তামাশা জাতীয় নাটক রচনা করে, তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অভিনয় করতেন। ১৯৬৮ সালে ওরা আর একটি থিয়েটার গ্রুপ, 'নোভা-মিনা' স্থাপন করেন যার সংযোগ ছিল ইতালিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে। তাদের এই রঙ্গ-নাটক ও তামাশাগুলো লেখা হয়েছে প্রধানতঃ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠান, মাফিয়াচক্র, চার্চ, পোপ, পুলিশ ও সরকারী আমলাদের কেন্দ্র করে। এবং এইসব অভিনয় প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফো ছিলেন একাধারে নাট্যকার, থিয়েটার-ম্যানেজার, অভিনেতা, ডিরেকটার এবং সমাজ-কর্মী। ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল নিয়ে তিনি কলকারখানা, পার্ক, ব্যারাকসার ইত্যাদি স্থানে সারা ইতালির প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত অভিনয় করে গণনাট্যের ধারা প্রবর্তন করেন।

তাঁর জন-প্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে আছে Morte accidentale di un anarchico (Accidental Death of an anarchist, 1974) Non Si paga, non Si paga (We can't pay we won't pay. 1974) Misuero Buffo (1974) ইত্যাদি। কলকাতায় কিছু থিয়েটার গ্রুপও দারিওর নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

৭১ বছর বয়সী দারিও ফো ১৯৯৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এখানে Archangels Don't Play Pinball নাটকটির একটি নির্বাচিত দৃশ্যের ভাষান্তর করা হয়েছে। এই নাটকটি ফো-রামা কোম্পানী মিলানের গুঞ্জনে ১৯৫৯ সালে মাঞ্চলোর সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ফরাসী এলিট সমাজ নিয়ে একটি কৌতুক রচনা এই নাটক দর্শকদের আনন্দ দেবে।

নাটকের তৃতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

[একটি শয়ন-কক্ষের সেট। একপাশে রাজকীয় শয্যা—চার-স্তম্ভওয়ালা বিরাট খাট। হলঘরে যাবার জন্য জানলা-দরজা, বাথরুমে যাবার দরজা। একদিকে একটা ডিভান এবং ছুটো আরামকেদারা। বাঁ দিকে একটি

পর্দা, তার পেছনে একটা লেখার টেবিল ও চেয়ার।

হলঘরের দরজা খুলে যায়। প্রবেশ করেন মেয়র এবং লক্‌টি নামের এক ভদ্রলোক।]

মেয়র : [সম্ভ্রমের সুরে] আসুন, আসুন। এই নিন দরজার চাবিটা। হ্যাঁ, ঘরটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?

লক্‌টি : [চারদিকে তাকিয়ে] মন্দ নয়। আচ্ছা এটা কি সেই ঘাট—আপনি বলেছিলেন যে এতে নেপোলিয়ন শুতেন?

মেয়র : হ্যাঁ, তিনি নিজেই। হোটেলে পরিণত হওয়ার আগে এই বাড়ীটা অস্ট্রিয়ান গভর্নরের হেডকোয়ার্টার ছিল।

লক্‌টি : আশ্চর্য তো! ক'টা ঘাটে নেপোলিয়ন শুতেন? যেখানে যেতেন, সেখানেই? তার শোয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না?

মেয়র : হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি কখনো এটা ভাবিনি। আপনি এমন সুরসিক মশা!
হয়নি আমার।

লক্‌টি : হতে পারে। দেখতে সত্তীর মনে হলেও আমি সে রকম মশা নই। [ডিভানের ওপর বসে পড়ল] মাফ করবেন, একটু বসলাম। এতটা হেঁটে এসে··· [স্বগত :] শিকার তুলে আনার কাজ নেবার আগে পর্যন্ত এতটা হেঁটতাম না।

মেয়র : কি বললেন?

লক্‌টি : না, না, ও কিছু নয়। [নিজের মনে :] পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়র : [ক্ষীত হয়ে] অবশ্যই। কিন্তু ক্ষমা করবেন—আপনি আজ সত্যিই চমৎকার! একজন মশা হয়ে যে আপনি ভেন্ট্রিলোকী দেখাতে পারেন—আশ্চর্য, ভাবতে পারা যায় না।

লক্‌টি : আমাদের সার্কেলে সব কিছুই সম্ভব। কেউ কেউ ভিসবাজী খায়—কেউ সিলিং এর ওপর হাঁটে, কেউ জলন্ত চাকার ভেতর দিয়ে লাফায়। ভোট-দেলা লোক সব। ওরা সব পারে।
[ছোট টেবিলের ওপর ওটি সুটকেশ দেখিয়ে বলে]] ওগুলো কার সুটকেশ? আমি একটা চুরি করে··· সাফ্‌ করবেন—একটা আমি এনেছি।

মেয়র : ওগুলো আপনার। লেন্তী কাল এখানে রাত্রি যাপন করেছিলেন।

লক্‌টি : নেপোলিয়নের খাটে?·····আমি ভাবছি পায়জামার সেই পোকার কথা—

মেয়র : কি বললেন?

লক্‌টি : না, আমি অ্যাঞ্জেলোর জন্যে চিন্তিত ছিলাম—আমার স্ত্রীর সম্পর্কে। সোনবাগের মধ্যে তাকে খুঁজে পাইনি। আর তখন থেকেই আমার পায়জামাটা খুঁজে পাচ্ছি না।
[সে সুটকেশটা খুলে তছনছ করার ভান করল—একটা বিছানায় রাখল]

মেয়র : আচ্ছা! ওটা যদি দরকার হয় তাহলে আমি আমারটা এনে দিচ্ছি—আমি এই বাড়ীতেই থাকি।

লক্‌টি : [সুটকেশ নিয়ে পরবার কাজে ডেস্কের ওপর রাখল] —না, না···একটা পায়জামার জন্য···

মেয়র : এটা কোন বড়ো ব্যাপার নয়। আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন।—হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম, একটা জরুরী কথা আছে। —হ্যাঁ এই যে নিন [একটা এনভেলাপ ওর হাতে দিল]

লক্‌টি : এটা কী? ও' আচ্ছা। আমি মন্ত্রীদের—কি না বলে—ওই ঘুষ দেওয়াটা বিশ্বাস করি না। [সে হাসে, মেয়রও হাসেন]

মেয়র : আপনি বিশ্বাস করবেন না—এটা খুব নয় ?

লক্‌টি : নয় ? কি লজ্জার ব্যাপার !

মেয়র : [স্বগত: কি চমৎকার ছোকরা—সব সময় মুখে রসিকতা লেগেই আছে] : মানুষের সব চেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর জন্য মনুমেন্ট তৈরী করার জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

লক্‌টি : [ব্যাপারটা ভাল করে] : কিসের জন্যে ? [দাঁড়িয়ে উঠে] ঐ নামটা কানে কটা বাজাচ্ছে।

মেয়র : হ্যাঁ, মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু—যেই হোক তার জন্য আমাদের মনুমেন্ট। আপনি যদি কিছু করতে পারেন এ ব্যাপারে—আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম—আপনার কি স্মরণ নেই ?

লক্‌টি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা বিশ্বস্ত কুকুরের জন্য স্মৃতি-স্তম্ভ ? অ্যাঁ ! [গড়গড় করল]

মেয়র : চমৎকার !.....

লক্‌টি : ধন্যবাদ ! কতো আছে এটায় ?

মেয়র : নব্বই লক্ষ লিরা। ৯০ লক্ষ হল মনুমেন্টের জন্য—বাকীটা কুকুরের খোঁয়াড়ের জন্য।

লক্‌টি : আপনারা কুকুরের খোঁয়াড়ও বানাবেন ?

মেয়র : হ্যাঁ, পুরোনোটা যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনার ধারণা নেই কতো বেওয়ারিশ কুকুরে শহরটা ভরে গেছে।

লক্‌টি : কিন্তু একটা চমৎকার প্ল্যান চেয়ার ? বেওয়ারিশ কুকুরের জন্য মৃত্যু আর বিশ্বস্ত কুকুরের জন্য স্মৃতি-স্তম্ভ ? চমৎকার আইডিয়া। [সে মেয়রের পিঠ চাপড়ায়] খুব ভালো। আমার কাছে আসা আপনার চতুরতার লক্ষণ বটে।

মেয়র : [গর্বে স্ফীত হয়ে] আমরা জানি আমাদের অর্থ সুযোগ্য লোকের হাতে পড়েছে।

লক্‌টি : আপনি খুবই সত্যি কথা বলেছেন।

মেয়র : [পথ দেখিয়ে] অনুগ্রহ করে এ দিকে আসুন।

লক্‌টি : কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

মেয়র : পাজামা আনতে।

লক্‌টি : [একটু দাঁড়িয়ে থেকে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাজামাও চাই বইকি। চলুন।

[ওদের প্রস্থান। দরজা বন্ধ হয়। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজায় আবার চাবির শব্দ। এলেনার প্রবেশ, তার পেছন পেছন আসেন মন্ত্রী। লক্‌টি নয়]

এলেনা : এখানে এসেছি আমরা। দেখ কি সুন্দর বিছানা—কতো বড়ো আর কি নরম। [হাত বুলিয়ে আদর করে] জানো কাল সারারাত ঘুমোইনি আমি। যখনই ঘুমিয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে—তখনই ভেবেছি যে ঘুমিয়ে পড়লে এই সুন্দর বিছানায় শোয়ার উপলব্ধিটা হারিয়ে ফেলব। এই ভয়ে ঘুমাতে পারিনি আলো জ্বালিয়ে রেখেছি—মুখে জলের ছিটে দিয়েছি জেগে থাকার জন্যে।

মন্ত্রী : [ওর দিকে সপ্রেম তাকিয়ে] : আমি জীবনে কিছু নির্বোধ লোকের সংস্পর্শে এসেছি—কিন্তু কেউই তোমার মতো নয়।

এলেনা : কে বলছে এ কথা ? এই লোকটা—যে পায়জামা পরে ঘুরে বেড়ায়—আণ্ডারপ্যান্ট পরা ট্রেনের গার্ডের পেছন পেছন দৌড়ায়। যখনি মনে পড়ে হোটেলের সেই দারোয়ানটার মুখটা—বাবা !—সে কেমন করে

তোমার দিকে তাকিয়েছিল!

মন্ত্রী : ও সব এখন রাখো!

এলেনা : আচ্ছা ঠিক আছে, বাবা। যে মহীটি তোমার বদলী এসেছিল—সে যদি আমার বন্ধু না হতো—তাহলে তোমার যে·····

মন্ত্রী : আমাকে একটু দয়া করবে? তোমার বন্ধু? সে তোমার প্রতি সদয় ছিল, কারণ সে খুব ভালো করে জানতো যে তুমি আমার স্ত্রী! [সুটকেশের দিকে তাকিয়ে] আমার সুটকেশ! আমার সুটকেশ তাহলে পাওয়া গেছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি ভাবছি—সে লোকটা কী ভেবেছিল আমার সম্বন্ধে—সে তোমাকে বিশ্বাস করেছিল—

এলেনা : [ডিভানে বসল, তারপর উঠে আর্ম-চেয়ারে বসল, আবার উঠে ছোট টেবিলের ওপর উঠে বসল।]
—চিন্তা নেই! আমি কখনোই তাকে বলিনি যে আমি তোমার স্ত্রী। আর আমার প্রতি সদয় হওয়া? সে সবসময়ই আমার প্রতি সদয়। উপ্-এ ওঠার আগেই। যদি সত্যি কথা শুনতে চাও—প্রথম সাক্ষাতেই সে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

মন্ত্রী : [সুটকেশ খুলে খুঁজতে খুঁজতে একটা শেভিং গাউন বের করলো]

এলেনা : ঠিক বিয়ের প্রস্তাব নয়—সে আমাকে তার গার্ল-ফ্রেণ্ড হতে বলেছিল। আমি ইতিমধ্যে ছিলাম—বলেছিলাম 'না'। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা—তোমাকে 'হ্যাঁ' বললাম। আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছিল।

মন্ত্রী : বদলাবার জন্য তোমার হাতে প্রচুর সময়—অবশ্য যদি তুমি চাও!

এলেনা : [একটু বিষাদগ্রস্ত] কি জানি। সে এখনো আমাকে চায় কিনা। [হেসে] সে এখন যে পর্যায়ে আছে।

মন্ত্রী : তার দ্বিতীয় চিন্তায় হতে পারে।

এলেনা : [ঠাট্টা বুঝতে না পেরে] কিন্তু না, যখন সে 'Rigoletto' খেলছিল তখন আমরা উপযুক্ত সম্পত্তি গড়ে পারতাম।

মন্ত্রী : [উজ্জ্বল হয়ে উঠে] তুমি যে অপেরাতে ছিলে, তা তো কখন বলোনি।

এলেনা : [আগের সুরেই] বলিনি বুঝি! সেখানেই আমি La Traviata-র পার্ট করেছিলাম।

মন্ত্রী : এসকিউজ মী। আমি যানে যাচ্ছি। তোমার অসুবিধা না হলে একটা গান গাও—তা না হলে আমি চান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। আমি খুব পরিশ্রান্ত। [বাথরুমে ঢুকে গেল। এলেনা রসিকতা বুঝতে পারল না। মন্ত্রী বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে বললো :]

মন্ত্রী : কি হল? কিছু বলো? তোমার সেই মহান প্রেম কাহিনী—যে মন্ত্রী রোম থেকে এসেছে। আমার বদলি —সে তোমার প্রেমে পড়েছে—হাঃ হাঃ! 'লাভলি ওয়েদার'—'সুন্দর আবহাওয়া' তার নাম?

এলেনা : [চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হলের দরজার কাছে গিয়ে বন্ধ করে চেঁচিয়ে অভিনয় শুরু করে] —কে? ও তুমি লাভলি? ভেতরে আসবে না প্রীজ। আমি এখন একা নই·····চলে যাও। সে বাথরুমে আছে···আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও? আচ্ছা··· ভেতরে এসো—কিন্তু মাত্র এক মিনিট! [সে দরজাটা খোলে, আবার বন্ধ করে। পায়ের শব্দ করে]
না, না, প্রিয়তম, শব্দ কোর না। সে শুনতে পাবে। আরে—আরে কি করছ? তোমার কী হয়েছে? না, না, আমাকে এ রকম করে জড়িয়ে ধরবে না। লাভলি, ছেড়ে দাও প্রীজ! চাও—না, না, সে শুনতে

পাবে। [সে শব্দ করে নিজের হাতে চুমু খেয়, তারপর তার হাতে চাপড় মারে]

—দুঃখিত, তোমাকে খারাপ মারলাম—নাঃ নাঃ।

[তারপর একবার পুরুষের গলা নকল করে, আবার নিজের গলায় বলে :]

—আমার সঙ্গে পালিয়ে চল।

—ছেড়ে দাও, আমার পোষাক ছিঁড়ে যাবে—গুডবাই ডারলিং—গুড বাই। আমার জন্যে নীচে অপেক্ষা

[আবার দরজা খোলার শব্দ করে, বন্ধ করার শব্দ করে। মজা পেয়ে হাসতে থাকে।]

[মন্ত্রী বাথরুমের দরজা খুলে বের হয়—এঞ্জেলার দিকে তাকায়, বলে : কে ?]

এঞ্জেলা—ওটা ওয়েটার ছিল—ভুল ঘরে এসেছিল।

মন্ত্রী : ওয়েটারের নাম বুঝি লাভলি ?

এঞ্জেলা—[অপ্রস্তুত না হয়ে] হা ঈশ্বর ! তুমি সব শুনেছ ? কিন্তু বিশ্বাস করো—আমি চাইনি—দরজাটা খোলা ছিল—আমি তাকে ভেতরে আসতে বাধা দিতে পারিনি।

[মন্ত্রী জমল-দরজার একটা খুলল, এটার পেছনে আর একটা]

মন্ত্রী : এই দরজাটা খোলা ছিল—কিন্তু অন্যটা ?

এঞ্জেলা : [দরজার হাতল ঘুরিয়ে] ওহা ! এ যে লকড্ ?

মন্ত্রী : [জোরে হেসে উঠল] হ্যা বন্ধ। এটা সব সময়ই বন্ধ ছিল। আমি বন্ধ করেছি। এই যাও চাবি ! তাহলে বলো তোমার লাভলি কি করে ঘরে ঢুকলো ? চাবির ছিদ্র দিয়ে ? হাঃ হাঃ হাঃ। [একটুক্ষণ চুপ করে থেকে]

—এবার যাও। নাটক করা চাওো। আমোদ দেবার জন্যে ধন্যবাদ—তোমার পার্ট ভালোই হয়েছে। আমার কয়েকটা চিঠি লেখার আছে। এখন বিছানায় যাও। ইচ্ছে হলে এই আলোটা নিভিয়ে দিতে পারো।

[সে দরজার পেছনে গেল। ভেজে দিয়ে বললো। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালো। এঞ্জেলা তার পায়ের জুতো ছুঁড়ে দিলো—একটা দরজায় গিয়ে লাগলো।]

মন্ত্রী : দেখ তো কেউ দরজায় নক্ করছে না তো ?

এঞ্জেলা : মজা তো ? [চাবি খুলে তাকায়—হলের দরজা খুলে গেল। লভ্‌টি ঘরে ঢুকল। সে প্রথমে এঞ্জেলাকে দেখতে পেল না। কিন্তু পরক্ষণে ফিস্‌ফিস্ করে বলল :]

এঞ্জেলা : লাভলি ! সর্বনাশ ! কি করে তুমি এখানে ঢুকলে ?

লভটি : এঞ্জেলা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! তুমি ফিরে এসেছো। আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি ঐ লোকটার সঙ্গে চলে গেছ।

এঞ্জেলা : [স্টেজের সামনে, একবারে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল]

—চুপ করো, সে এখানেই আছে। পরদাটার পেছনে।

লভটি : সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

[মন্ত্রী হাসল। ভাবল এঞ্জেলা আবার অ্যাকটিং শুরু করেছে]

এঞ্জেলা : [ফিস্ ফিস্ করে] না, সে চিঠি লিখছে। তুমি যাও আমাদের কথা শুনতে পাবে।

লকটি : আমি যাবো না, তোমাকে না নিয়ে যাবো না।

[মন্ত্রী লেখা ছেড়ে কান পাতলো—মুচকি হেসে আবার লিখতে শুরু করল।]

এলেনা : [লকটিকে জড়িয়ে ধরল, গালে চুমু দিল, বলল :]

লকটি : একটা চুমু দেই! [চুমু দিল একটা, সঙ্গে সঙ্গে চড়ও খেল একটা]

এলেনা : ভূষিত। আমাকে ছেড়ে দাও। আমার পোষাক ছিঁড়ে ফেলবে···ছাড়ো···

লকটি : নতুন একটা কিনে দেব।

[মন্ত্রী লিখেই চলেছে—যার কথা শুনে মজা পাচ্ছে। বলল—সবই সাদা।]

এলেনা : তুমি বললে সবটাই সাদা?

লকটি : না আমি বলিনি। তবে তুমি যদি চাও—একটা সাদা পোষাকই কিনে দেব।

এলেনা : কিন্তু কি করে আমি বেরিয়ে যাবো?

লকটি : যে ভাবে আমি এসেছি। এই যে চাবি আমার কাছে। চল যাই।

[এলেনা সুটকেশ হাতে নেয়, লকটি সাহায্য করে। মন্ত্রীর সুটকেশটাও নেয়, লকটি সাহায্য করে।]

এলেনা : কি দুঃখ! এই মনোরম বিছানাটা ফেলে যেতে হচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

মন্ত্রী : [ওপাশ করতে] খুব ভালো, খুব ভালো। টপ, হয়েছে, লাইনেরে পৌঁছে গেছ। [চিঠিগুলো ভাঁজ করতে করতে] কিন্তু ওভার অ্যাকটিং হয়ে গেছে।

—পুরুষের কণ্ঠস্বরটা নকল করতে গিয়ে। 'কিন্তু দরজা খুলবে কী করে? চাবিতো আমার কাছে।'

[দরজার কপাট থেকে বেরিয়ে এসে]

—এলেনা। এলেনা। কোথায় তুমি। কোথায় লুকিয়েছো? [খাটের নীচে দেখল] এলেনা?

[হলের দরজা খুলে যায়, মেয়র প্রবেশ করে]

মেয়র : মন্ত্রীজী, এই যে আপনার পাজামা—

মন্ত্রী : [উঠে দাঁড়িয়ে] আপনি বলছেন?

মেয়র : [আশ্চর্য হয়ে] মাপ করবেন, আপনি কে?

মন্ত্রী : [বিরক্ত হয়ে] কি বলছেন? আমি কে?—আমি···কি করে আপনি ভেতরে ঢুকলেন?

মেয়র : কেন, দরজা দিয়ে—ওটা খোলা ছিল।

মন্ত্রী : খোলা ছিল? [পরীক্ষা করে] তাই তো! আপনি খোলেন নি?

মেয়র : না, মন্ত্রী কোথায় গেলেন?

মন্ত্রী : এই তো আমি। কী চান আপনি?

মেয়র : [রেগে গিয়ে] বোকার মতো কথা বলবেন না। মন্ত্রীমশায় কোথায়?

মন্ত্রী : [লাফিয়ে উঠে] : চুপ করুন। কোন মন্ত্রীর কথা বলছেন?

মেয়র : কেন লাতালি ওয়েবার?

মন্ত্রী : লাতালি ওয়েবার?

মেয়র : হ্যাঁ তিনিই। এখানে ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন এখানে, যদিও জানি তিনি তাঁর গার্ল-ফ্রেণ্ড। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?

মন্ত্রী : (চুপ করে গেলেন, কথা খুঁজে না পেয়ে, বলে,) মন্ত্রী লাভাল অয়েদার। তাঁর অস্তিত্ব আছে তা হলে ?

মেয়র : কেন তিনি থাকবেন না ? তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী আমরা পেয়েছি। তিনি কোথায় গেলেন ?

মন্ত্রী : (মূর্ছা যাবার উপক্রম)—সে আমার গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে উধাও হয়েছে—আরে, আমার সুটকেশও নিয়ে গেছে—আমার কাপড় সব !

মেয়র : আঃ উনিও আপনার গার্লফ্রেণ্ড।

মন্ত্রী : [কাঁদ কাঁদ ভাবে] আমার ট্রাউজার সব গেছে। ডেস্ক থেকে চিঠি খোলার চাকুটা হাতে নিয়ে তেড়ে গেল মেয়রের কাছে] খোল, তোমার ট্রাউজার খোল—খোলো ট্রাউজার !

মেয়র : [ভয় পেয়ে] আরে করছেন কি ?

[মন্ত্রী মেয়রের পেছনে পেছনে ঘুরছে, চাকু উঁচিয়ে বলছে :]

মন্ত্রী : খোল তোমার ট্রাউজার, না হলে···

মেয়র : আরে খুলছি, খুলে দিচ্ছি, তোহাই আপনার, আমাকে পোলেটিক্যালি কইন করবেন না।

[মেয়র ট্রাউজার খুলে মন্ত্রীর হাতে দিল। ঠিক সেই সময়ে আণ্ডার প্যান্ট পরা গার্ড ঢুকলো—ট্রাউজারটা দেখেই সে মন্ত্রীর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালালো—বলতে বলতে···]

গার্ড : ট্রেনের সময় হয়ে গেছে···এখনই ছাড়বে

[পর্দা পড়ে গেল]

SPACE DONATED BY

A

WELL

WISHER

With best Compliments of—

*

M/s. MOKALBARI KANOI TEA

ESTATE PRIVATE LTD.

13/2 Ballygunje Park Road, Calcutta-1

With Best Compliments From

PURNA DISTRIBUTORS

A house of distribution of pharmaceutical & consumer products

Regd. Off. 5/1, A.J.C. Bose Road, Calcutta-700020. Phone 240-4091

With Best Compliments From

ASHISH ENTERPRISES

17B, Mahanirban Road, Calcutta-700029

With Best Compliments From :—

*

M/s. KANOI INDUSTRIES

PVT. LTD.

With Best Wishes From :—

Ila Kaji

With Best Compliments From

Electrical Enterprise

H. B. TOWN

SODEPUR—24 PARGANAS

With Best Wishes From

B. G. Bhavnani

BOMBAY

SPACE DONATED BY—

A

WELL

WISHER

With Best Compliments From

SHIBAM ENTERPRISES

for

- Pagelink Pager & Cellular Phones
- All Types of Telecom Products

174, Kankulia Road, Calcutta 700 029

Phone—(033) 440-9606

Mobile No.—98310-01315

কলকাতা আর কলকাতার
স্বর্ণময় অতীত, কলকাতার চলমান
বর্তমান, কলকাতার স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ,
কলকাতার শিল্প সাহিত্য, মানুষ
মানুষের জীবন নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার
নিরন্তর পথ চলার লক্ষ
উন্নত পরিষেবা।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

কলিকাতা পৌরসংস্থা

With Best Compliments From :—

M. G. COMMERCIAL PVT. LTD.

Anubad Patrika—in the eyes of the elite

Thanks to your support 'Anubad Patrika' has throughtout been able to remain focused on its non-commercial journalistic mission of "Translations for Integration" Its efforts have received generous praise and some of the comments over the years are given below :-

"'Anubad Patrika' completed 20 years some days ago. Its very title makes clear its special character, the kind of writings its Editor wishes to present to readers ; which he has been doing for the last 20 years, providing, in his Patrika, selections from all Indian languages and foreign literature. Translating is a tough task. It cannot be easy to make the heart-beats of one language throb in another. Even less easy perhaps, is to create bouquets of translations pleasing to readers. By performing both these difficult tasks admirably, 'Anubad Patrika' 'keeps the banner of College Street• flying high". •, publishing district of Calcutta)

Ananda Bazar Patrika (The leading Bengali Newspaper)

"'Anubad Patrika' is really doing remarkable work in the field of translation ……Our nation needs platform like Anubad Patrika to achieve our dream of National Integration."

Dr. Ganga Prasad Vimal

(Director-Central Hindi Directorate & Noted Hindi poet)

"Despite lack of funds & publicity preventing it from drawing very wide attention to itself, a small magazine 'Anubad Patrika' has for long 12 years been totally dedicated to translations… …it is something to be happy about that this Patrika's silent Karamyog has been recognized in 1986 with the 'Ananda Puraskar'". (Bengal's most prestigious literary award),

Desh (The foremost Bengali Magazine)

Khwaja Ahmed Abbas said he was "happy." Kishen Chandra called it "a step in National Cohesion", Arjun Dev Majboor (Kashmiri Poet) termed it "a noteworthy venture" Annada Shankar Roy, Vivekanada Mukherjee, Narayan Chowdhury among others made a strong plea for full support from all quarters echoing the sentiments expressed by the noted Gujrati author Suresh Joshi.

Suresh Joshi in an interview to Times of India said, "there is only one 'Anubad Patrika' ……which cares to ask me to translate something from Gujrati…this Patrika must live. We should keep it alive".

With Best Compliments from :—

L' INTIMO

FASHIONS PVT. LTD.

Manufacturers And Exporters Of High Fashion Garments.

Regd. & City Office :
BA-74, Sector-1, Salt Lake, Calcutta-700064
Tele : 337-8125, 321-7476. Tele Fax : 91-33-3218886
Telex : 215380 BID IN ATTN IT-195

Factory

VILL & P.O. GANGANAGAR. DIST. 24 PGS (North)
WEST BENGAL Tele : 512-5687

SANJEEV KAPOOR

of 'Khana Khazana'

reveals the key ingredient of his tasty soya dishes

MEALMAKER

the better alternative

ealmaker fulfils protein - needs
ithout cholesterol, without fat

LMAKER the 100%
'anian food that gives
o proteins. Free of
sterol, it is better than
egg, milk and paneer
oked, therefore, easily
ible, it makes tasty
utritious food dishes
iryani, Vegetables,
s, Sweet Dishes.
by itself or mix it
ny dish
MAKER good
s for good health

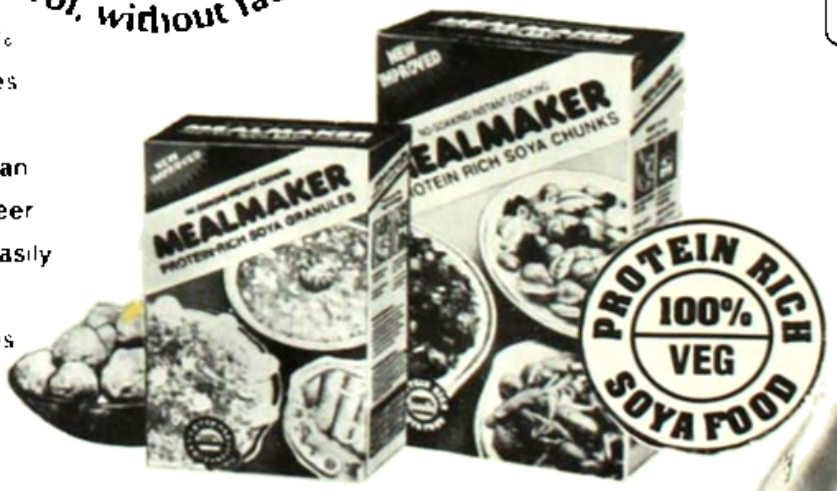

"MEALMAKER
is the secret of my tasty soya dishes
Enjoy taste ... health

MEALMAKER

PROTEIN RICH SOYA CHUNKS

ঘরতে আজ
কোন অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে...

Tata Tea

॥ আমাদের পুজো ॥